পথের কাহিনী

পথের কাহিনী

শ্রীমন্মথনাথ দত্তগুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান
রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীবারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য

২১ মোহনবাগান রো,

কলিকাতা

বৈশাখ ১৩৪৯

মূল্য দুই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস

২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

৭'২—২. ৫. ৪২

ভূমিকা

'পথের কাহিনী'র লেখক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দত্তগুপ্ত আমার যৌবনের সুহৃদ। তিনি বাংলা সাহিত্যে নবাগত। ফলিত রসায়নের কারবারী তিনি, ভারতবর্ষের বৃহত্তম কারখানার সহিত রাসায়নিক হিসাবে যুক্ত। পাঠ্যাবস্থা হইতেও মন্মথনাথ ভাবপ্রবণ এবং আর্ত্ত ও পীড়িতের প্রতি সহানুভূতিশীল। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া এই ভাবপ্রবণতা ও সহানুভূতি বিনষ্ট না হইয়া যে বৃদ্ধি পাইয়াছে, 'পথের কাহিনী' তাহার প্রমাণ। এই যুগের মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা যাহা—অন্নসমস্যা, তাহার সমাধানের চেষ্টায় কারণে এবং অকারণে কত দিক দিয়া তাহাকে নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়, এবং এই নিগ্রহের প্রতিকার যে এই সকল আর্ত্ত ও পীড়িত মানুষের সমবেত শক্তিতেই সম্ভব, 'পথের কাহিনী'তে গল্পচ্ছলে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এই 'পথের কাহিনী' মধুর নয়, মনোহরও নয়, কণ্টককঠিন এবং অশ্রুসিক্ত। রসসাহিত্যের দিক দিয়া লেখক সর্ব্বত্র রসোত্তীর্ণ হইয়াছেন—এ কথা বলিতে পারিব না। যে সকল সমস্যা আমাদের বর্ত্তমান জীবনধারায় অতিশয় প্রবল আকার ধারণ করিতেছে, এই পুস্তকে সেগুলিরই সমাধানের চেষ্টা দেখিয়া

আমি লেখককে সাধারণ্যে পরিচিত করাইবার ভার সানন্দে গ্রহণ করিয়াছি। 'পথের কাহিনী' প্রেমের কাহিনী নয়, রোমান্সও নয় ; এ যুগের মানুষকে লইয়া প্রেম এবং রোমান্সকে বাদ দিয়াও যে কৌতূহলপ্রদ কাহিনী রচনা করা চলে, ইহা তাহারই একটি দৃষ্টান্ত। এই কাহিনীতে যে সকল সমস্যা উত্থাপিত হইয়াছে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ যুগে সেই সকল সমস্যাই অধিকাংশ মানুষের সমস্যা হইবে। যিনি নিজে কর্ম্মী হিসাবে কাজ করেন, এমন একজনের নিকট হইতে সমাধানের ইঙ্গিত পাইয়া আমাদের সামাজিক দিক দিয়াও সুবিধা হইবে মনে করি। বাংলা কথা-সাহিত্য বিষয়বস্তুর অভাবে গতানুগতিকতাদোষদুষ্ট হইতে বসিয়াছে বলিয়া যাঁহারা আক্ষেপ করেন, তাঁহারা এই নূতন সম্ভাবনা দৃষ্টে আনন্দলাভ করিবেন।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

পথের কাহিনী

১

নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি, শীতের হাওয়া কেবল বহিতে শুরু করিয়াছে। এক ছুটির দিনের শেষ বেলায় রাস্তার ভিড় ঠেলিয়া একটি ছাত্র বই হাতে করিয়া হাঁটিয়া আসিতেছিল। আজ সমস্ত দিন সে বই পড়িয়াই কাটাইয়া দিয়াছে। পড়ুয়া ছাত্র বলিয়া প্রফেসর-মহলে তাহার সুনাম আছে। য়ুনিভার্সিটির পরীক্ষাগুলি সে কৃতিত্বের সহিতই পাস করিয়া আসিয়াছিল, এইবার তাহাকে শেষ পরীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে হইবে। কিন্তু বন্ধুদের কাছে তাহার দুর্নামের অন্ত নাই। তাহাদের খেলা-ধূলা ও উৎসবের সঙ্গী সে হয় না, তাই তাহারা অনুযোগ করে।

নিকটেই চৌমাথার উপরে যে বড় লাইব্রেরিটি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেইখানে এমনই সন্ধ্যায় তাহাকে প্রতিদিন আসিতে দেখা যায়। অনেকদিনের পুরাতন লাইব্রেরি, নানা প্রকার গ্রন্থে পরিপূর্ণ। অধ্যাপক ও গবেষণারত

ছাত্রদের প্রায়ই ভিড় হয়। বৃদ্ধ লাইব্রেরিয়ান তাহাকে অতিশয় সুচক্ষে দেখেন, এবং নিজে সাধিয়া ভাল বই বাহির করিয়া পড়িতে দেন। কখনও বা বলেন, দেবব্রত, এই বইখানা নতুন এসেছে, তুমি পড়বে ব'লেই রেখে দিয়েছি। সে ধন্যবাদ জানায়, খুশি হইয়া ফিরিয়া আসে। কোন দিন বা তাহার কোন পরিচিত অধ্যাপকের সহিত দেখা হইয়া যায়। সে নিজে উৎসুক হইয়া তাঁহার সঙ্গে বিভিন্ন বই লইয়া আলোচনা করিতে থাকে, তাহার অনেক সময় কাটিয়া যায়।

লাইব্রেরির হল-ঘরে প্রায়ই বক্তৃতা হইতে থাকে। এই রাজধানীর অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগম হয়। অনেক প্রসিদ্ধ বক্তা সমাজের বিভিন্ন সমস্যা লইয়া, বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক প্রভৃতি বিষয় লইয়া বলিতে থাকেন। সে কখন কখন সেসব শুনিয়া ফিরিয়া আসে।

সেদিনও হল-ঘর লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। একজন অধ্যাপক বক্তৃতা দিতেছিলেন। এই বৃদ্ধ অধ্যাপক ছাত্র-মহলে সুপরিচিত। ভাল বক্তা বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে, তাই কলেজের ছাত্রেরা দলে দলে উপস্থিত হইয়াছে। দেবব্রতও বইগুলি ফিরাইয়া দিয়া তাহাদের ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল।

পথের কাহিনী

অধ্যাপক মানুষের কীর্ত্তি ও অপকীর্ত্তির কথা, সভ্যতার কথা, অন্যায় ও অবিচারের কথা একে একে বহুক্ষণ বলিতে লাগিলেন। বিশেষ করিয়া ছাত্রদের সম্মুখে কঠিন পথের কথাই বারে বারে স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। সেই পথে ব্যর্থতার বোঝা বহিয়া, অবিচার সহিয়া দিন যেন তাহাদের না কাটে, ইহাই তিনি বুঝাইতে চাহিতেছিলেন।

ছেলের দল উৎসুক হইয়াই শেষ পর্য্যন্ত শুনিতে লাগিল। দেবব্রত কেমন যেন নির্ব্বাক হইয়া পড়িয়াছিল। এমন সে আর কোন দিন শুনিয়াছে বলিয়া তো তাহার মনে পড়িল না। ভবিষ্যতের পথটা কেমন, তাহা তাহার জানা নাই, তবু তাহার দৃষ্টি যেন অনেকখানি খুলিয়া গেল। বক্তৃতা-শেষে বাহবা দিয়া সকলে যখন ফিরিয়া আসিতেছিল, সে নিঃশব্দে হাঁটিয়া আসিতে লাগিল। অধ্যাপকের কথাগুলি তখনও তাহার মন সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। বারে বারে সেইগুলি সে মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল।

২

কলেজে বন্ধুদের কাছে দেবব্রতকে মাঝে মাঝে কৈফিয়ৎ দিতে হয়। সে বিজ্ঞানের ছাত্র, কিন্তু তাহার সময় কাটে সাহিত্য ও ইতিহাসের বই পড়িয়া। তাই তাহারা বলে, দেবব্রত, এই নীরস বিজ্ঞান-কলেজে প্রবেশ করা তোমার মোটেই উচিত হয় নি। ওসব পড়বার স্থান তো আরও আছে, সেইখানে গেলেই তো পারতে ?

সে হাসিয়া জবাব দেয়, কি করব, পথ ভুলে অনেক দূর এসে পড়েছি, এখন তো আর ফিরে যাওয়া চলে না।

বস্তুত সে বন্ধুদের হাত এড়াইবার পথ খুঁজিয়া বেড়ায়।

সেদিনও সে নিজের মনে কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিল, এমন সময় একটি ছাত্র আসিয়া চঞ্চলতার সৃষ্টি করিয়া তুলিল। ছাত্রের নাম অরুণ। বলিল, নমস্কার দেবব্রত, খবর সব ভাল ?

সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, এতদিন কোথায় ছিলে অরুণ ?

অরুণ কহিল, কোথায় যে ছিলাম, তার আর কি কিছু ঠিক আছে ? এক স্থানে তো স্থির হয়ে ছিলাম না।

কলেজে আস নি কেন ?

অনেক কাজ ছিল, সেসব ফেলে তো আসতে পারি না।

পথের কাহিনী

কলেজ খুলেছে কবে, আর তোমার সময় হ'ল আজ, এ তো ভাল কথা নয়।

অরুণ কহিল, কি করব বল, মাঝে মাঝে কামাই করা যে আমার স্বভাব, তা কি তোমার জানা নেই ?

দেবব্রত চুপ করিয়া রহিল। অরুণ প্রফেসর ও ছাত্র-মহলে সুপরিচিত, বন্ধুরাও তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়া ঐ একই প্রশ্ন করিতে লাগিল, অরুণবাবু, আজ পথ ভুলে আসেন নি তো ?

সে স্মিতমুখে জবাব দিল, না, পথ চিনেই তো এলাম। এ তো এমন কিছু গোলমেলে রাস্তা নয় যে ভুল হয়ে যাবে।

তবে এত দিন কোথায় ডুব দিয়েছিলেন ?

অরুণ বলিল, ডুব দিই নি কোথাও, বরাবর জেগেই ছিলাম। তবে এই বাঁধা রাস্তার বাইরে পা দিতে দেখলেই আপনারা যদি আঁতকে ওঠেন, আমি তার কি করব বলুন ?

বেশ বেশ, তা হ'লে পরোপকার ক'রেই সময়টা কাটিয়েছেন নিশ্চয়ই।

কিছুই করা হয় নি। আপনারা যেভাবে লেগেছেন, তাতে কি কিছু করবার উপায় আছে ?

পরোপকারী বলিয়া বন্ধুদের কাছে অরুণের সুনাম আছে। দেশের অনেক সৎকার্য্যে সে ভলান্টিয়ারি করিয়াছে। দুর্ভিক্ষ,

পথের কাহিনী

মহামারী ও বন্যা প্রভৃতির সময় দেশের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি যখনই যুবকদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, অরুণ বরাবরই তাহাতে সাড়া দিয়া আসিয়াছে। তাহার উন্নত ও বলিষ্ঠ দেহ সহসা লোকের চোখে পড়ে। লোকের দুঃসময়ে, আপদে-বিপদে সাহায্য করা তাহার স্বভাব। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সৈনিক-বৃত্তি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত একটা ব্যবস্থা আছে। বৎসরে দুই এক মাস করিয়া শিক্ষা লইতে হয়। অরুণ কলেজ-জীবনের প্রথম হইতেই তাহাতে যোগ দিয়াছিল এবং বছর তিনেক শিক্ষালাভও করিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর কি কারণে যেন তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। উপস্থিত হইবার নিমিত্ত তাহার প্রতি আর আদেশ জারি করা হয় নাই। এবং সেও নিষ্কৃতি পাইয়া নিজের মনে ভলান্টিয়ারি করিয়া বেড়ায়। কলেজে অনুপস্থিত থাকার দরুন বন্ধুদের উপহাস এবং প্রফেসরদের তিরস্কার সে অনেক সহ্য করিয়াছে। এখন সেসব তাহার গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে। সেদিনও নূতন প্রফেসর জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হে, এতদিন কোথায় ছিলে? পড়াশুনা করবার ইচ্ছে আছে, না নেই?

খুব ইচ্ছে আছে সার্।

তবে কলেজে আস না কেন?

অনেক কাজ ছিল, তাই আসতে পারি নি।

এবার পরীক্ষা দেবে, না, দেবে না ?

নিশ্চয়ই দোব, আপনি দেখে নেবেন পরীক্ষার দিনে ঠিক এসে হাজির হয়েছি।

প্রফেসর মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন। অরুণ সেদিন বন্ধুদের মধ্যে কে কি করিতেছে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। তাহাদের সহিত স্বাস্থ্যনীতি আলোচনা করিল। কাহার দেহে কতখানি শক্তি আছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া সময়টা কাটাইয়া দিল। তারপর কলেজ-শেষে দেবব্রতর সহিত বাহির হইয়া আসিল।

রাস্তায় আসিয়া দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, কাল আবার আসছ তো ?

অরুণ বলিল, আসব কি না ঠিক বলতে পারছিঁ না।

তবে কি আজ শুধু আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলে ?

না, একটু কাজ ছিল। কলেজের মাইনে বাকি পড়েছিল, সেটা দিয়ে গেলাম।

দেবব্রত এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, মিছিমিছি টাকাগুলো নষ্ট ক'রে কি লাভ, পরীক্ষায় পাস তো আর করতে পারবে না।

পাস করতে পারব না কেন ?

কলেজে না এলে, পড়াশুনা না করলেই ফেল করতে হবে।

অরুণ কিছুকাল নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, পাস আমি ঠিক করব, তা তুমি দেখে নিও। য়ুনিভার্সিটির এতগুলো পরীক্ষায়ই যখন উতরে গেছি, তখন এই শেষ পরীক্ষাটাও যে সেইগুলোর ধাক্কাতেই পার হয়ে যাব, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দেবব্রত চুপ করিয়া রহিল। অরুণ পুনরায় বলিল, তবে তুমি একটা কাজ ক'রো।

কি কাজ?

বইগুলো খুব ভাল ক'রে মুখস্থ ক'রে রেখো, তাতে আমারও উপকার হতে পারে।

দেবব্রত কথা কহিল না, মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল। কিছুদূর হাঁটিয়া আসিয়া সে বলিল, আজ তোমাকে আমার বাসায় একবার যেতেই হবে।

অরুণ বলিল, এখন? অসম্ভব।

অসম্ভব কেন?

এখন আমার সময় নেই, অনেক কাজ আছে।

এমন কি কাজ আছে যে, যেতে পারবে না?

অরুণ বলিল, সেসব কথার মূল্য তো তোমার কাছে কিছুই নেই, তাই না বলাই ভাল।

কতদিন যাও নি, মনে ক'রে দেখ দেখি।

কিছু ভাবনা নেই, আবার একদিন হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হব, তোমার চমক লেগে যাবে।—বলিতে বলিতে একটা মোড়ের কাছে আসিয়া অরুণ থামিয়া গেল। তারপর সেই রাস্তার মাঝখানে, সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া, মিলিটারী ফ্যাশানে একটা সেলাম ঠুকিয়া বলিল, গুড বাই। তারপর লোকের ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ছেলেবেলায় ইহারা দুইজনে গ্রামের স্কুলে একসঙ্গে পড়াশুনা করিত, এবং একসঙ্গেই স্কুল ও কলেজের ধাপগুলিও ডিঙাইয়া আসিয়াছে। সেই সময় হইতে ইহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব এখন পর্য্যন্ত অটুট রহিয়াছে।

দেবব্রত আর অপেক্ষা করিল না, বাসার দিকে রওনা হইয়া পড়িল ; কিন্তু আজ যে অরুণ তাহার অনুরোধ রক্ষা করিল না, সেজন্য সে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিল।

৩

গলির ভিতর একটা ছোট দোতলা বাড়ি ভাড়া করিয়া দেবব্রত কয়েক বৎসর হইল বাস করিতেছিল। অধ্যাপক পিতা তাহার নিমিত্ত কয়েক হাজার টাকা এবং কিছু সম্পত্তি রাখিয়া ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। সেই অবধি সংসারে সে নিরবচ্ছিন্ন একা, কেবল ভৃত্য জহর তাহার একমাত্র সঙ্গী। আর রাখিয়াছিলেন একখানা মোটর-গাড়ি, তাহা সে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে, কেন না তাহার প্রয়োজন হয় না।

তাহার এই ছোট বাড়িখানিও সে নিজের ইচ্ছামত সাজাইয়া লইয়াছে। বারান্দার ধারে ধারে ফুলের টব বসাইয়া, দেওয়ালের গায়ে ছবি টাঙাইয়া ইহাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। অনেকগুলি বই কিনিয়া কয়েকটা আলমারি ভর্ত্তি করিয়া ফেলিয়াছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতির বই অনেক মূল্য দিয়াই তাহাকে সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। বই কিনিয়া আলমারি সাজানো তাহার খেয়ালবিশেষ। ভৃত্য সময় সময় প্রতিবাদ করে, কিন্তু কোন ফল হয় না।

বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনের সংখ্যাও তাহার খুব বেশি নাই। কিন্তু যাহারা তাহার কাছে আসা-যাওয়া করে, তাহাদের

অনেকেরই উজ্জ্বল পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে চাহিয়া তাহার চমক লাগিয়া যায়। তাহারা মাঝে মাঝে উপহাস করিয়া বলে, দেবব্রত, এই যন্ত্র-যুগে গাড়িখানা বিক্রি করা কি তোমার উচিত হয়েছে? কেহবা বলে, তুমি শুধু লাইব্রেরির পথই চিনে রেখেছ; অন্য রাস্তাগুলির দিকে কি তোমার দৃষ্টি যায় না? কিন্তু সে এসব কথার জবাব দেয় না। বরং তাহাদের সহিত তাহার এই সযত্নে সংগ্রহ-করা বইগুলির বিষয় লইয়াই সময়টা কাটাইয়া দেয়।

জহর অনেক দিনের পুরানো চাকর। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি হইবে। কুস্তিগিরিতে একদিন সে দক্ষ ছিল এবং সেই কারণে এই বৃদ্ধবয়সেও তাহার দেহের বাঁধন শক্ত আছে। দেবব্রতর অতি ছোটবেলা হইতেই সে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছে। তাহারই নির্দ্দেশমত দেবব্রত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি যন্ত্র কিনিয়া বাড়ির মধ্যে একটা ছোটখাটো আখড়া গড়িয়া তুলিয়াছিল, এবং ডন বৈঠক, দোল খাওয়া, ডিগবাজি খাওয়া প্রভৃতি কসরৎগুলি রীতিমত অভ্যাস করিত। কিন্তু বর্ত্তমানে সেসব ছাড়িয়া দিয়াছে।

তাই সেদিন জহর বলিতেছিল, বাবু, যন্ত্রগুলো মরচে ধ'রে গেল, এস, আবার সেইসব আরম্ভ করা যাক।

দেবব্রত বলিল, এখন আর ওসব ভাল লাগে না।

দেহটা তোমার খারাপ হয়ে যাচ্ছে, অন্ত কোন কসরৎ না হয় অভ্যেস কর।

দেবব্রত বলিল, আমার সময় নেই।

জহর কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, গাড়িখানা বেচে ফেলে কি ক্ষতিই না করেছ! এখন আর তেমন হাওয়া খাওয়া হয় না।

ওসব না করলেও কোন ক্ষতি হয় না।

বাবু, অষ্টপ্রহর বই পড়লে মাথা খারাপ হয়ে যায়। আলমারিতে কত যে জমেছে, তার ঠিক নেই। ওগুলো কিছু কিছু ক'রে পুরনো বইয়ের দোকানে দিয়ে আসি, কি বল?

দেবব্রত উত্তর দিল না। জহর নিরাশ হইয়াই ফিরিয়া আসিল।

প্রভু এবং ভৃত্যের মধ্যে এমন অনেকদিনই হইয়া থাকে এবং জহরের আপসোসেরও সীমা থাকে না।

৪

সেদিন রবিবার, দেবব্রত অভ্যাসমত বিকালের দিকে বই হাতে করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু লাইব্রেরির রাস্তা ছাড়িয়া দিয়া, অনেক দূর হাঁটিয়া একটা বড় বাড়ির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। চারিদিকে বাগান দেওয়া হাল-ফ্যাশানের একটা বিরাট অট্টালিকা সগর্ব্বে উঁচু হইয়া আছে। ইহার সর্ব্বাঙ্গে আভিজাত্যের ছাপ লোকের চোখে স্পষ্ট হইয়াই ফুটিয়া উঠে। গেটে দরোয়ান পাহারা দিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিল। সে গেট পার হইয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গৃহস্বামীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গৃহস্বামীর নাম নৃপেন্দ্র। বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি হইবে ; কিন্তু চেহারা দেখিলে আরও বেশি বলিয়াই মনে হয়। একখানা উজ্জ্বল টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি কি একটা খেলায় মত্ত ছিলেন। দেবব্রতকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এতদিন আমার সঙ্গে দেখা কর নি কেন ?

এতদিন তো আপনি এখানে ছিলেন না, কেমন ক'রে দেখা করব ?

আমেরিকা থেকে ফিরেছি কবে, আর তুমি উপস্থিত হ'লে আজ ?

দেবব্রত বলিল, আমি জানতাম না যে, আপনি ফিরে এসেছেন। আমাকে একটা খবর দিলেও তো পারতেন।

খবর নিজে এসে মাঝে মাঝে নিতে হয়। যাক, আজ কি মনে ক'রে এসেছ?

এই বইগুলো নিয়ে গিয়েছিলাম, ফিরিয়ে দিতে এসেছি।

ও, সেই পুরনো বইগুলো? আচ্ছা, রেখে দাও।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, আবার শিগগির কোথাও চ'লে যাবেন না তো?

নৃপেন্দ্র বলিলেন, কিছু ঠিক নেই, যেতেও পারি। তারপর এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শুনলাম তোমার দেশের জমিগুলো সব নাকি লোকদের বিলিয়ে দিয়েছ?

দেবব্রত বলিল, তাই তো দোব ভাবছি।

হঠাৎ এমন দুর্ম্মতি হ'ল কেন?

দুর্ম্মতি আর কি? নিঃস্ব লোক তারা, তাই ভাবছি, ওসব তাদের দিয়ে দোব।

নৃপেন্দ্র হঠাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, নিঃস্বই হোক আর যাই হোক, তোমার তাতে কি এসে যায়? যারা অযোগ্য, যারা অক্ষম, তাদের সাহায্য করার কি মূল্য আছে?

দেবব্রত শান্তভাবে জবাব দিল, আমার তো আরও রয়েছে, ওসব না হ'লেও চ'লে যায়।

নৃপেন্দ্র বলিলেন, রয়েছে ব'লেই নিজের জিনিস বিলিয়ে দিতে হবে, এমন কোন কথা নেই। বরং নিজের সম্পত্তি যেমন ক'রেই হোক বৃদ্ধি করবার চেষ্টা করতে হবে। ঐশ্বর্য্য এবং ক্ষমতা—পৃথিবীতে এই ছুটোই সব, আর সবই বাজে। এই বাড়ি-ঘর, গাড়ি-ঘোড়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, এইগুলোই সভ্যতার উপকরণ। এইসবই মানুষের কাম্য। আর তুমি চলেছ উল্টো পথে। লোক তোমাকে উপহাসই করবে।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, এসব কি আপনার মনের কথা ?

নৃপেন্দ্র বলিলেন, মনের কথা নয় তো কি ? এই পৃথিবীতে আছে শুধু সবলের জয়জয়কার। ছুর্ব্বলের স্থান কোথায় ? তাদের সাহায্য ক'রে কি লাভ ?

দেবব্রত চুপ করিয়া রহিল। কথা-কাটাকাটি করিবার প্রবৃত্তি তাহার ছিল না এবং জবাব দিবারও ইচ্ছা তাহার হইল না ; কেন না তাহা নিরর্থক। কিন্তু কেমন যেন অস্বস্তি সে বোধ করিতেছিল, তাই উঠিয়া আসিবার উপক্রম করিতে লাগিল।

নৃপেন্দ্র পুনরায় কহিলেন, এই সহজ কথাগুলো এখনও তোমার জানা নেই। ভাবছিলাম, তোমার নিজের ভালমন্দ

তুমি নিজেই বুঝতে পারবে, কিন্তু তার কোনই আশা দেখছি না।

এই কটূক্তির পর সে আর অপেক্ষা করিল না। বিদায় না লইয়াই নিঃশব্দে উঠিয়া আসিল। নীচে আসিয়া একটা ছোট ঘরে প্রবেশ করিল। এই ঘরে বাড়ির যত অব্যবহার্য্য জিনিসপত্র টানিয়া আনিয়া গুদাম করিয়া রাখা হয়। ইহারই এক কোণে কয়েকটা আলমারিতে কতকগুলি বই এলোমেলোভাবে পড়িয়া আছে। একপুরুষ আগে এই বাড়ির কে একজন পড়ুয়া লোক ঐগুলি ক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে ওসবের মূল্য ছিল, কিন্তু এখন আর নাই। সে আলমারি খুলিয়া হাতের বইগুলি রাখিয়া দিল। কত অমূল্য গ্রন্থই যে এইভাবে অবহেলায় পড়িয়া আছে, তাহার ঠিক নাই। সে সযত্নে বইগুলির ধূলা ঝাড়িয়া গুছাইয়া রাখিয়া দিল, তারপর নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিল।

আহত মন লইয়াই সে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। নৃপেন্দ্রের সহিত তাহার নিকট-আত্মীয়তা আছে। সেই সূত্রে সে এই বাড়িতে আসা-যাওয়া করে। এই বাড়ির ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর সে স্বচক্ষে কতই তো দেখিয়াছে। কিন্তু ইহারই আড়ালে যে দাম্ভিক মন এত দিন প্রচ্ছন্ন ছিল, আজ তাহা তাহার চোখে সহসা যেন প্রকট হইয়া উঠিল। নৃপেন্দ্রের উক্তিগুলি

আজ তাহাকে আঘাত করিল। এমন তো সে আশা করে নাই। তাহার শিক্ষা-দীক্ষা ও মনোবৃত্তির সহিত এসবের কতই না প্রভেদ! সে ভাবিল, আর না, এই বাড়িতে বেশি আসা-যাওয়া আর চলিবে না, এবং প্রয়োজনই বা কি?

৫

বড়দিনের ছুটি উপলক্ষ্যে চারিদিক সভাসমিতি ও বক্তৃতায় মুখর হইয়া উঠিয়াছে। স্থানে স্থানে প্রদর্শনী ও উৎসবের মেলা বসিয়াছে। দেবব্রত সেইসব বক্তৃতা শুনিয়া বিভিন্ন প্রদর্শনী ও আর্ট-গ্যালারি প্রভৃতি দেখিয়া সময়টা কাটাইয়া দিতেছিল।

সেই যে সেদিন কলেজ হইতে ফিরিবার পথে অরুণ বিদায় লইয়াছিল, তারপর আর তাহার দেখা নাই। দেবব্রত অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিল, কিন্তু কোথায় যে সে উধাও হইয়াছে, কেহ তাহা জানে না।

সেদিনও সে বক্তৃতা শুনিয়া ও প্রদর্শনী দেখিয়া সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিতেছিল, এমন সময় রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ অরুণের সহিত তাহার দেখা হইয়া গেল। ছোট একটা ব্যাগ কাঁধে ঝুলাইয়া লইয়া কোথায় যেন সে চলিয়াছে।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, এতদিন কোথায় ছিলে অরুণ?

অরুণ বলিল, এখানে ছিলাম না, সবে কাল ফিরে এসেছি।

তোমায় কত যে খুঁজেছি তার ঠিক নেই।

অরুণ বলিল, ভাবছিলাম, তোমায় একটা খবর দোব, কিন্তু তাও আর হয়ে ওঠে নি।

পথের কাহিনী

চল, আমার বাসায় যাবে।

এখন আর সময় হবে না, আর একদিন যাওয়া যাবে।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, এখন কোথায় যাবে ?

একটু কাজ আছে, তাই যেতে হবে। বরং তুমিই আমার সঙ্গে চল না কেন, কিছুক্ষণ ঘুরে আসবে।

কোথায় যেতে হবে ?

বেশি দূর নয় এবং বেশি দেরিও হবে না।

দেবব্রত একমুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া লইয়া বলিল, আচ্ছা, চল।

অনেকদিন পর অরুণের সঙ্গে দেখা হইয়া তাহার মনটা খুশি হইয়া উঠিয়াছে। দুইজনে পাশাপাশি চলিতে লাগিল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, কয়েকটা রাস্তা পার হইয়া অরুণ একটা অল্পপরিসর গলির ভিতর প্রবেশ করিল। গলিটা এত সংকীর্ণ যে, দুইজন লোক পাশাপাশি চলিতে পারে না। তাহার উপর নিবিড় অন্ধকার, সম্মুখে পথ দেখা যায় না।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, এদিকে কোথায় চলেছ অরুণ ? পাতালপুরীর রাস্তা নয় তো ?

না, তবে খুব সাবধানে এস, মাঝে মাঝে গর্ত্ত আছে, সেগুলি এড়িয়ে চ'লো।

এই তো মুশকিলে ফেললে, চোখে কি কিছু দেখা যায় যে গর্ত্ত ডিঙিয়ে যাব ?

তবে দাঁড়াও, আলো জ্বেলে নিই।—বলিয়া দিয়াশলাই-কাঠি জ্বালাইয়া আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল, এবং কিছুক্ষণ পরে একটা পুরানো বাড়ির সম্মুখে আসিয়া থামিয়া গেল। বহুদিনের পুরাতন একটা দ্বিতল অট্টালিকা জীর্ণ দেহ লইয়া কোনমতে দাঁড়াইয়া আছে। অরুণ সেই বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল এবং ততোধিক এক জীর্ণ সিঁড়ি ধরিয়া দোতলায় উঠিয়া আসিল। নিকটেই একটা ঘরের দোর-গোড়ায় আসিয়া ডাক দিল, মিহির! একটি আঠারো-উনিশ বৎসরের ছেলে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, এই যে অরুণদা, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

অরুণ বলিল, বড্ড দেরি হয়ে গেছে। খবর সব ভাল?

মিহির বলিল, ভাল, সেজন্যে আপনার কোন ভাবনা নেই। তারপর দেবব্রতর দিকে চাহিয়া বলিল, আপনাকে এমন স্থানে দেখতে পাব, তা কোন দিনও আশা করি নি, বড্ড আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে।

ছেলেটি দেবব্রতর পরিচিত, তাই সে ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিল, আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই, তবে এই অন্ধকার গলির সন্ধান তুমি কি ক'রে পেলে, আমি সেই কথাই ভাবছি।

মিহির বলিল, আমি? আমি তো এইখানেই বাস করি।

ঐ যে আমার থাকবার স্থান।—বলিয়া আঙুল দিয়া একখানা তক্তাপোশ দেখাইয়া দিল।

কিন্তু অরুণ আর অপেক্ষা করিল না, পাশের একটা ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই ঘরে একখানা খাটিয়ার উপর একজন বৃদ্ধ জ্বরে অর্দ্ধচেতন অবস্থায় পড়িয়া আছেন। অরুণ তাঁহার শিয়রের কাছে আসিয়া বসিল। ব্যাগ হইতে গোটা কতক ঔষধের শিশি বাহির করিয়া জানালার ধারে রাখিয়া দিল। মিহিরকে বলিল, এই ওষুধগুলো রইল, রাত্রে খাওয়াতে হবে। তারপর বৃদ্ধের দেহের উত্তাপ লইল, নিজ হাতে ঔষধ ঢালিয়া খাওয়াইয়া দিল। বৃদ্ধের সুবিধার নিমিত্ত যাহা করিবার ছিল, সে নিপুণ হস্তে সেইসব অনেকক্ষণ ধরিয়া করিতে লাগিল।

কিন্তু দেবব্রতর সন্ধানী মন অন্য দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এতবড় বাড়ি, কিন্তু কোথাও তেমন আলো নাই, লোকজনের সাড়া নাই, শব্দ নাই। সে পাশের ঘরগুলি উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। অধিকাংশ ঘরই অন্ধকার। কোন ঘরে বা ছোট মোমবাতি মিটিমিটি জ্বলিতেছিল। তাহারই অস্পষ্ট আলোকে জিনিসপত্রগুলি আবছায়ার মতই দেখা যাইতেছিল। সে দেখিল, প্রতি ঘরের মেঝের উপর বহু ছোট ছোট বিছানা ইতস্তত ছড়ানো রহিয়াছে, এবং সেইগুলির উপর কেহ কাত

হইয়া, কেহ চিত হইয়া, কেহ বা হেলিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। তবে অধিকাংশ বিছানাই শূন্য, ধূলায় লুটাইতেছিল। সে মিহিরকে একসময়ে নিরিবিলি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঘরগুলো এমন অন্ধকার কেন? আর এত লোক চুপচাপ ব'সেই বা আছে কেন বলতে পার?

মিহির বলিল, আপনি কি বুঝবেন এসব?

বুঝব না কেন?

মিহির ইতস্তত করিয়া উত্তর দিল, আলো জ্বালতে পয়সা খরচ হয়, এত পয়সা কোথায় পাওয়া যাবে? তারপর একমাত্র চিন্তাই যাদের সম্বল, তারা চুপচাপ ব'সে থাকবে না তো করবে কি?

দেবব্রত বিমূঢ়ের মত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মিহির পুনরায় বলিল, বুঝলেন না বোধ হয়? জীবন-পথে পা দিয়ে হঠাৎ যারা দেখতে পায় যে, এই পৃথিবীতে আলো আর বাতাস ছাড়া তাদের আর কিছুই নেই, তারা ওসব করবে না তো করবে কে? সমস্ত দিন পথে পথে ঘুরে বেড়ায় এবং প্রতি দ্বারে ধাক্কা খেয়েই ফিরে আসে। সন্ধ্যেয় এই আস্তানাতে ঢুকে অসাড় হয়ে পড়ে, আবার ভোরবেলা বেরিয়ে যায়।

দেবব্রত আর প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না। কে জানে

অলক্ষ্যে কোথায় ইহাদের আবার আঘাত করিয়া বসিবে, তাই সে চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু মিহির ছাড়িল না, পুনরায় বলিতে লাগিল, সহসা যদি কেউ চেয়ে দেখে যে, তার শিক্ষা-দীক্ষা সব ধূলোয় লুটিয়ে গেছে, পশুহাটার জীবের মতই নিজেকে বিকিয়ে দিতে হচ্ছে, ভাবনা তাকে আপনি এসে চেপে ধরে। সে ছাড়তে চায়, ছাড়তে পারে না।

কিন্তু তাহার কথার স্রোতে বাধা পড়িয়া গেল। অরুণ আসিয়া বলিল, এইবার তা হ'লে যাওয়া যাক, কি বল মিহির? ওষুধগুলো রইল, সময়মত খাওয়াবে।

মিহির অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, সেজন্যে কোন ভাবনা নেই দাদা, দরকার হ'লে সারারাত জেগে কাটাব।

বেশ, কাল আবার দেখা হবে।—বলিয়া দেবব্রতকে সঙ্গে করিয়া সে নীচে নামিয়া আসিল। দুইজনে আবার সেই অন্ধকার গলিটা সাবধানে পার হইয়া আসিল।

রাস্তার আলোতে আসিয়া দেবব্রত যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু সেই অন্ধকার বাড়িটা এখন তাহার চোখে রহস্যাবৃত হইয়াই দেখা দিতেছিল। বিশেষ করিয়া বৃদ্ধের রুগ্ন মূর্ত্তি তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। তাই সে জিজ্ঞাসা করিল, এই বৃদ্ধ কে অরুণ?

অরুণ বলিল, কে যে, তা আমার ঠিক জানা নেই। সবে কাল তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে।

মিহির কিছু বলে নি?

বলেছে। কি একটা অফিসে তিনি চাকরি করতেন, কিন্তু ইদানীং সেটা চ'লে যায়, তাই ঐ বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়েছে। শুনেছি, একজন পরোপকারী লোক ছিলেন।

চাকরিটা গেল কেন?

কেন, তা আমি ঠিক বলতে পারব না। সেই চাকরির যাঁরা মালিক, তাঁরাই ভাল জানেন। তবে শোনা যায়, তাঁদের নাকি আর প্রয়োজন নেই।

দেবব্রত বলিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এখন যে আর জীবন-ধারণেরও উপায় নেই!

আশ্চর্য্য হবার কি আছে? এমন তো কতই চোখে পড়ে।

দেবব্রত প্রশ্ন করিল, তাদের যখন প্রয়োজন হয়, নিয়ে নেয়, আবার খুশিমত ঠেলে ফেলে দেয় নাকি?

অরুণ বলিল, এসব প্রশ্নের উত্তর আমি ঠিক দিতে পারব না। চাকরি দেবার ও নেবার যারা মালিক, সেই শক্তিশালী লোকদেরই বরং জিজ্ঞাসা ক'রো।

দেবব্রত চুপ করিয়া রহিল। অরুণ একটা মোড়ের কাছে

আসিয়া বলিল, এইবার আমায় বিদায় দাও, আমার আরও কাজ আছে।

আচ্ছা, কিন্তু আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে?

শিগগিরই তো কলেজ খুলছে, সেইখানেই দেখা হবে।—বলিয়া ভিন্ন রাস্তা ধরিয়া সে চলিয়া গেল।

দেবব্রত একলা ফিরিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু এইমাত্র স্বচক্ষে যাহা সে দেখিয়া আসিল, তাহা সহজে ভুলিতে পারিল না। নিজের মনে কত প্রশ্নই যে সে করিতে লাগিল, তাহারও সীমা নাই, এবং সেইগুলির জবাবও সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। সমস্ত রাস্তাটা কি যেন কাঁটার মত তাহার বুকের মধ্যে বারে বারে বিঁধিতে লাগিল।

৬

এই ঘটনার পর একপক্ষকাল গত হইয়াছে। অরুণ প্রতিদিন কলেজে আসা-যাওয়া করিতেছিল, আর কামাই করে নাই। সেদিন ছুটির পর দেবব্রতকে জিজ্ঞাসা করিল, আজ আমার সঙ্গে যেতে পারবে ?

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যেতে হবে ?

মিহিরদের সেই মেসে, একটু কাজ আছে। তারপর এক মুহূর্ত্ত ইতস্তত করিয়া বলিল, তোমার সঙ্গে টাকা আছে ?

আছে।

আমায় দিতে পারবে ?

খুব পারব ; কিন্তু কি করবে টাকা দিয়ে ?

অরুণ বলিল, মিহিরের বড় অসুখ, তাই দরকার হয়ে পড়েছে।

দেবব্রত পকেট হইতে কতকগুলি টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি অসুখ মিহিরের ?

নিমোনিয়া, হাসপাতালে আছে।

হাসপাতাল আছে ? আর এতদিন আমায় বল নি ?

এতদিন আমিও জানতাম না, সবে কাল খবর পেয়ে দেখা ক'রে এসেছি। তার মেসের ম্যানেজারের সঙ্গেও দেখা

হয়েছিল, কিছু টাকা তাকে দিতে হবে। টাকাগুলো একসময়ে তোমায় ফিরিয়ে দোব।

দেবব্রত বলিল, ফিরিয়ে দেবার কথা তো তোমায় বলি নি, দরকার হ'লে আরও চেয়ে নিও। কিন্তু চল, মিহিরের সঙ্গেও একবার দেখা ক'রে আসি।—বলিয়া তাহার সঙ্গে রওনা হইয়া পড়িল।

কেমন করিয়া মিহির অসুস্থ হইয়া পড়িল, সেই কথাই অরুণ চলিতে চলিতে সবিস্তারে বর্ণনা করিতে লাগিল। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে সে ঐ অন্ধকার মেসে আশ্রয় লইয়াছিল, টিউশনি করিয়াই কলেজে পড়ার খরচ তাহাকে সংগ্রহ করিতে হইত। কিন্তু ইদানীং সেটা তাহার শেষ হইয়া যায়, ফলে কলেজে আসা-যাওয়াও তাহার প্রায় বন্ধ হইয়া আসে। শীতের প্রথম দিকে গায়ের র‍্যাপারখানা বিক্রয় করিয়া সে কিছুদিন খরচপত্র চালাইয়াছিল। তারপর, একটা গরম কোট ছিল, সেটাও বিক্রয় করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু তাহাতেও সে কূল পাইল না। সেদিন একটা পার্কে সে অনেক রাত অবধি বসিয়া ছিল। সঙ্গে সামান্যই জামা-কাপড়, তাহার ক্লান্ত ও বুভুক্ষু দেহটা কখন যে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, তাহা সে নিজেও বোধ করি অনুভব করে নাই। তাই ভোরের দিকে পুলিস আসিয়া তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিতে বাধ্য

হয়। সেই অবধি নিমোনিয়া হইয়া সেইখানেই পড়িয়া আছে।

অরুণ কিছুকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, সেই মেসের লোকদের অবস্থার কথা কিছু না বলাই ভাল। মিহির তাহার টিউশনি-করা, কোট-র‍্যাপার বিক্রি-করা পয়সা দিয়ে তাদের সাহায্য করত। রোগে ওঁষুধ কিনে দিত, অসময়ে পয়সা দিয়ে অনাহারের হাত থেকে রক্ষা করত। এই কারণেই তার দেনা হয়ে পড়েছিল। অবসর-সময়ে খবরের কাগজ, মাসিক-পত্রিকা প্রভৃতি সংগ্রহ ক'রে এনে তাদের প'ড়ে শোনাত। কখন বা এক লাইন গান গেয়ে, এক পাক নেচে তাদের মেসের ঢাকা-মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলত। আঁধার ঘরের আলোর মতই সে ঐ বাড়িতে বাস করছিল। কিন্তু নিমোনিয়া যেভাবে তাকে চেপে ধরেছে, পরিণামে যে কি হবে, তাই বা কে জানে!—বলিয়া সে চুপ করিল।

দেবব্রত এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল, এইবার সে মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। মিহিরের সহিত তাহার অনেকদিনের পরিচয়। চৌমাথায় উপর সেই লাইব্রেরিতেই তাহাদের প্রথম আলাপ হইয়াছিল। তারপর অনেকদিন সে তাহার বাসায় আসিয়াছে, আলমারি হইতে বই বাহির করিয়া লইয়া

গিয়াছে। কখন বা নিজে ভাল বই সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাহাকে পড়িতে দিয়াছে। এইভাবেই তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। এহেন মিহির অসুস্থ হইয়া হাসপাতালে পড়িয়া আছে, সে মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

অরুণ সেই মেসে আসিয়া ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করিল। ম্যানেজারবাবু হিসাবের খাতা খুলিয়া অনেকক্ষণ পরিশ্রম করিয়া মিহিরের দেনার পরিমাণটা জানাইয়া দিলেন। তারপর একগাল হাসিয়া বলিলেন, সস্তায় যারা থাকতে চায় তাদের এইখানে আসতেই হবে। যাই বলুন না কেন, এমন সস্তা আর কোথাও মিলবে না।

অরুণ ঘাড় কাত করিয়া তাঁহার কথা মানিয়া লইল। তারপর কতকগুলি টাকা পকেট হইতে বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিল। ম্যানেজারবাবু অবাক হইয়া বলিলেন, এত টাকা তো পাওনা হয় নি।

অরুণ বলিল, না হোক, তবু কিছু টাকা আপনার কাছে জমা থাক। আপনার হিসেবে ভুল তো থাকতে পারে।

ম্যানেজারবাবু বিস্মিত হইয়াই বলিলেন, এমন তো এ মেসে কেউ কখনও দেয় নি।

না দিক, তবু আপনি রেখে দিন। ভবিষ্যতে দরকার হতে পারে।—বলিয়া নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিল।

সেই দিনের সেই বৃদ্ধ আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতার সহিত অনেক কথাই বলিতে লাগিলেন। বিশেষ করিয়া মিহিরের অসুখের সংবাদ বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

অরুণ মিহিরের তক্তাপোশের কাছে আসিয়া তাহার বিছানাটা ঝাড়িয়া গুছাইয়া রাখিয়া দিল। খবরের কাগজ, মাসিক-পত্রিকা প্রভৃতি ইতস্তত ছড়াইয়া ছিল, সেগুলি পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। জানালার ধারে ছোট একটা মোমবাতি ছিল, সেটা জ্বালাইয়া রাখিয়া দেবব্রতকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

রাস্তায় আসিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সে আবার একটা বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল। দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, আবার এখানে কি করবে?

অরুণ বলিল, চল তো, দেখতে পাবে। বলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া দোতলায় লইয়া আসিল এবং একটি ছোট ঘর খুলিয়া বলিল, এইটি আমার বর্ত্তমান বাসস্থান। অল্পদিন হ'ল এখানে এসেছি।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, যে মেসে ছিলে, সেটা ছেড়ে দিলে কেন?

ছাড়লাম অনেক কারণে। এখানে অনেক সুবিধে, বেশ নিরিবিলি থাকা যায়।

কতদিন থাকবে এখানে, শিগগির আবার বদলাবে না তো ?

অরুণ বলিল, কিছু ঠিক নেই, বদলাতেও পারি। যতদিন না অন্যত্র চ'লে যাই, ততদিন তুমি এখানে এলেই আমার খোঁজ পাবে।

দেবব্রত দেখিল, ঘরে জিনিসপত্র বিশেষ কিছুই নাই। এক দিকে একটা তক্তাপোশের উপর একখানা কম্বল পাতা রহিয়াছে। ইহাই অরুণের বিছানা। দেওয়ালের গায়ে, একটা মিলিটারী ব্যাগ ঝুলিতেছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, কি আছে ঐ ব্যাগের ভেতর ?

অরুণ বলিল, বিশেষ কিছু নেই। তবে ওটা আমার পথ চলার সম্বল। ঘরে জিনিসপত্র যা কিছু দেখছ, সব ওর ভেতর পুরে নিয়ে বেশ আরামে ঘুরে বেড়ানো চলে।—বলিয়া সে নিজের কথায় নিজেই হাসিয়া উঠিল।

একটা ঝুড়ির ভিতর কতকগুলি ফল ও অন্যান্য খাবার জিনিস ভর্ত্তি ছিল, অরুণ সেটা খুলিয়া লইয়া বলিল, একটি পরিচিত লোক এইগুলো পাঠিয়ে দিয়েছেন। এস, দুজনে উদরস্থ করতে চেষ্টা করি।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ তিনি এসব পাঠাতে গেলেন কেন?

অরুণ বলিল, কবে তাঁর সামান্য উপকার করা গিয়েছিল, সে কথা তিনি এখনও ভুলতে পারেন নি, তাই মাঝে মাঝে এইসব পাঠিয়ে থাকেন। তাঁর যত্নের দেওয়া জিনিসগুলো অবহেলা করা তো চলবে না, তাই এস, সদ্ব্যবহার করা যাক।

দেবব্রত আপত্তি করিল না। দুইজনে বসিয়া সেই আহার্য্যগুলি শেষ করিল। তারপর অরুণ উঠিয়া কিছু আবশ্যকীয় জিনিস সঙ্গে লইয়া বলিল, চল, এইবার হাসপাতাল যাওয়া যাক।

যখন তাহারা হাসপাতালে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মিহিরের ঘরে আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহাদের চক্ষুস্থির হইয়া গেল। তাহার অবস্থা ক্রমশ দ্রুতগতিতে খারাপের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ডাক্তার, নার্স, কম্পাউণ্ডার প্রভৃতি ঘিরিয়া বোধ করি তাহাদের শেষ চেষ্টা করিতেছিল। দুইজনে নির্ব্বাক নিস্তব্ধ হইয়া পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল। এমন যে শক্ত অরুণ, সেও যেন হতভম্ব হইয়া গেল। ইহা তো সে আশা করে নাই। ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া ডাক্তার যখন বিদায় লইয়া গেল, তখন অনেক রাত হইয়া পড়িয়াছে।

অরুণ বলিল, এইবার তুমি বাসায় ফিরে যাও দেবব্রত।

আর তুমি?

আমাকে এখানেই রাতটা কাটাতে হবে।

আমিও তা হ'লে এইখানেই কাটাব।

অরুণ বলিল, কোথায় থাকবে তুমি এই শীতের রাত্রে? তোমার অভ্যেস নেই, বাসায় ফিরে যাও।

এই শীতের রাত্রে অন্য লোক কি এখানে থাকবে না?

থাকবে; কিন্তু কষ্ট ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে কোন উপকার তো হবে না।

না হোক, কিন্তু আমার কষ্ট হবে না, তোমার কোন ভাবনা নেই।

অরুণ চুপ করিয়া রহিল। দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, এখন কি করা যায় বল দেখি?

করবার আর কিছুই নেই। এস, দুজনে শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকি। তা ছাড়া আর কি উপায় আছে বল? কতক্ষণ যে ঐ ভাবে কাটিয়া গেল ঠিক নাই। কিন্তু ঘরের ভিতর তাহাদের কেমন যেন অসহ্য বোধ হইতেছিল, তাই তাহারা একসময়ে বাহিরে আসিয়া বসিল। তখন রাস্তায় লোকচলাচল থামিয়া গিয়াছে। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ। আকাশ ভরিয়া অসংখ্য তারা সেদিন যেন উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া

রহিয়াছে, দিকদিগন্তের পথটি আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। ভোরের দিকে মিহিরের আত্মা ইহলোক হইতে বিদায় লইয়া গেল।

অবশিষ্ট কাজগুলি অনেক সহজ, অরুণ তাহারই আয়োজন করিতে লাগিল। পরদিন হাসপাতালের গাড়ি করিয়া মিহিরের শেষ কাজটা সে সম্পন্ন করিয়া আসিল।

সেদিন অনেক বেলায় দেবব্রত একলা নদীর পাড় হইতে ফিরিয়া আসিতেছিল। ক্লান্তিতে দেহ তাহার ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মনের ভিতর তখন তুফান বহিতেছিল। বারে বারে কেবল সে এই প্রশ্নই করিতে লাগিল যে, এই যে আজ একটি লোক এমন ভাবে ইহলোক হইতে চলিয়া গেল, ইহার নিমিত্ত কাহারও কি কিছু করিবার ছিল না? রাজধানীর পরিপূর্ণ আহার্য্যের মাঝখানেই তো দেহটা তাহার অনাহারে ভাঙিয়া পড়িল এবং অবশেষে বিদায় লইয়া গেল। মনুষ্য-সমাজের কাছে দাবি কি তাহার কিছুই ছিল না? বিষয়ী লোকের কাছে এসব প্রশ্নের মূল্য হয়তো কিছুই নাই; এমন তো কতই ঘটিতেছে। ইহার নিমিত্ত কাহার কি করিবার আছে? দাবিদাওয়াই বা কি আছে? কিন্তু অবুঝ মন তাহার সেদিন বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিল না। কেবলি তর্ক করিতে লাগিল, বলিতে

লাগিল, না না, পাওনা তাহার অনেক ছিল, দাবিও তাহার অনেক ছিল। এমনই ভাবে নিজের মনের সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া সমস্ত রাস্তাটা সে হাঁটিয়া আসিল।

৭

ইহার পর কয়েক মাস অতীত হইয়াছে, ফাল্গুনের হাওয়ায় রাজধানী শৌখিন হইয়া উঠিয়াছে। সেই যে সেদিন নৃপেন্দ্রের বাড়ি হইতে দেবব্রত চলিয়া আসিয়াছিল, তারপর আর সেখানে সে যায় নাই। ভাবিয়াছিল, আর যাইবে না। কিন্তু সেদিন হঠাৎ একখানা চিঠি পাইয়া সে বিব্রত হইয়া পড়িল। নৃপেন্দ্র সদলবলে পাখি শিকার করিতে বাহির হইবেন, তাই তাহাকে যোগ দিবার নিমিত্ত ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। সে মন স্থির করিতে পারিল না। কিন্তু ইহা নৃপেন্দ্রের অনুরোধ নয়, আদেশ। এমনই অনেক আদেশ সে এতদিন পালন করিয়া আসিয়াছে, আর আজ ইহাকে কেমন করিয়া অবহেলা করিবে? তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও নির্দ্দিষ্ট দিনে সে রওনা হইয়া গেল।

মোটরযোগে মহানগরীর সীমানা ছাড়াইয়া, বহু দূরে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে যখন তাহারা আসিয়া পৌঁছিল, তখন বেশ বেলা হইয়া পড়িয়াছে। দেবব্রত দেখিল, মাঠের মধ্যে সারি সারি অনেকগুলি তাঁবু খাটানো আছে। অনেক লোক পূর্ব্বেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। গান বাজনা ও উৎসবের প্রচুর আয়োজন রহিয়াছে। আর্দ্দালী, বেয়ারাদের ছুটাছুটি এবং বন্দুকের ফাঁকা

আওয়াজে সমস্ত স্থানটা গরম হইয়া উঠিয়াছে। নিকটেই নদী, কিন্তু কোথাও তেমন বন নাই, শিকার করিবার মত পশুপক্ষীও নাই। চারিদিকে কেবল ফাঁকা মাঠ, মাঝে মাঝে সামান্য গাছপালা, এবং তাহারই উপর ক্বচিৎ দুই একটা ঘুঘু প্রভৃতি পাখি ইতস্তত উড়িয়া বেড়াইতেছিল, বন্দুকের আওয়াজে সত্রাসে পলাইতেছিল। এইগুলিই শিকারের লক্ষ্য এবং ইহারই নিমিত্ত এত আয়োজন। সে মনে মনে হাসিল।

অনেক বেলা অবধি উৎসব চলিতে লাগিল। খানাপিনা শেষ করিয়া সকলে যখন শিকার করিতে বাহির হইল, দেবব্রতের মনে তখন আর উৎসাহ ছিল না ;কেমন যেন বিতৃষ্ণা ধরিয়া গিয়াছিল। তবু সে দলের সহিত বাহির হইয়া পড়িল। মাঠের পর মাঠ পার হইয়া গেল। কত ঝোপের ধারে, গাছের তলায় কতবার যে চুপ করিয়া দাঁড়াইল এবং কত ডোবা, জলা-ভূমিই যে ডিঙাইয়া গেল, তাহারও সীমা নাই। পশু-শিকারের প্রয়োজনীয়তা যাহাই থাক, কিন্তু এই যে ব্যাধের মত ঘুঘুর পিছনে পিছনে ছুটিয়া বেড়ানো, ইহাতে যে কোন আনন্দ নাই, কোন সৌন্দর্য্য নাই, এই কথাই সেদিন সে অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিতে লাগিল। তাই এক সময়ে দলছাড়া হইয়া কখন যে সে মাঠের অপর প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে সেদিকে তাহার খেয়াল ছিল না। তখন বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে।

ক্লান্ত দেহটাকে জুড়াইয়া লইবার উদ্দেশ্যে সে এক স্থানে হাত পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া আজিকার উৎসবের কথাই মনে মনে জল্পনা করিতেছিল। এমন সময় তাহার চোখের সম্মুখে এমন এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়া গেল, যাহার দরুন তাহার দেহ ও মন মুহূর্ত্তে সজাগ হইয়া উঠিল। নিকটেই একটা অসমতল রাস্তা ধরিয়া একখানা মোটর-গাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু অকস্মাৎ তাহা একটা খাদের ভিতর কাত হইয়া পড়িয়া গেল। কেমন করিয়া এই দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল, তাহা সে বিশেষ লক্ষ্য করে নাই। কিন্তু যাহা দেখিল, তাহাতে কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার দুই চক্ষু স্থির হইয়া রহিল। কিন্তু দেরি করিবার উপায় ছিল না, তাই সে ছুটিয়া গিয়া গাড়ির কলকব্জা প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দিল। চালকের সংজ্ঞাহীন দেহটা বাহির করিয়া আনিল। তাহার মাথার কাছে খানিকটা স্থান কাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতেছিল, সে রুমাল দিয়া তাহা বাঁধিয়া দিল। লোকটির বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি হইবে, পরিধানে সাহেবী পোশাক। গাড়িতে ঐ একটি বই দ্বিতীয় প্রাণী নাই। কিন্তু কেন যে তিনি এই তেপান্তরের মাঠের মধ্যে অমন অপথ ধরিয়া আসিতেছিলেন, তাহা তাহার কাছে রহস্যময় হইয়া উঠিল। কেমন করিয়া এই সংজ্ঞাহীন লোকটিকে সে হাসপাতালে

পৌঁছাইয়া দিবে, তাহা সে স্থির করিতে পারিল না। নিকটেই এক দল লোক মাঠে কাজ করিতেছিল, সে ছুটিয়া গিয়া তাহাদের ডাকিয়া লইয়া আসিল এবং তাহাদের সাহায্যে গাড়িখানা ঠেলিয়া সোজা করিয়া লইল; কলকব্জা সব পরীক্ষা করিয়া দেখিল। দামী গাড়ি, এই আঘাতে জখম হইয়াছিল মাত্র, কিন্তু অচল হয় নাই। সে যেন আশার আলোক দেখিতে পাইল। সাহেবের অচেতন দেহটা গাড়িতে তুলিয়া লইয়া দ্রুত রওনা হইয়া পড়িল। কে এই বৃদ্ধ, তাহা তাহার জানা নাই; কিন্তু সমস্ত রাস্তাটা তাহার দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। যদি তাঁহার কোন অমঙ্গল হয় এই আশঙ্কায় সে প্রাণপণে গাড়ি চালাইতে লাগিল। অনেকক্ষণ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে হাসপাতালে পৌঁছাইয়া দিয়া সে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তারপর অবশিষ্ট কাজ শেষ করিয়া, মোটর-গাড়ির ব্যবস্থা করিয়া, সে অনেক রাত্রে সেদিন বাসায় ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু পরদিন হাসপাতালে আসিয়া সে আর সাহেবের দেখা পাইল না। শুনিল, তিনি অনেকটা আরোগ্যলাভ করিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া গিয়াছেন। সে মনে মনে নিশ্চিন্ত হইল। তাঁহার নাম, ধাম, ঠিকানা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া সে ফিরিয়া আসিল। বৃদ্ধের নাম—ব্যানার্জী সাহেব।

এই ঘটনার পর এক সপ্তাহ কাল কাটিয়া গিয়াছে। সে মন হইতে ইহাকে এক প্রকার মুছিয়াই ফেলিয়াছিল। সাহেবের সহিত তাহার আর যে কোন দিন দেখা হইবে, এমন আশা সে করে নাই। কিন্তু হঠাৎ সেদিন এক পোশাক-পরা দরোয়ান আসিয়া তাহার হাতে একখানা চিঠি দিয়া তাহাকে বিস্মিত করিয়া তুলিল। চিঠিখানা খুলিয়া দেখিল, ব্যানার্জী সাহেব তাহাকে দেখা করিবার নিমিত্ত ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। দরোয়ানকে বিদায় দিয়া সে কাগজখানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কয়েকবার পড়িতে লাগিল। ইহাতে বিশেষ কোন অনুরোধ ছিল না, ছিল আদেশ। কেন যে আদালতের পরওয়ানার মত তাহার উপর এই আদেশ জারি হইল, এই কথাই সে ভাবিতে লাগিল।

তবু অবসরমত এক ছুটির দিনে সে সাহেবের সহিত দেখা করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ অনেক পথ অতিক্রম করিয়া শহরের পূব অঞ্চলে এমন এক স্থানে আসিয়া সে উপস্থিত হইল, যাহার চারিদিকে শুধু কারখানা ও কয়লার ধোঁয়া। কি একটা কারখানার মালিক এই ব্যানার্জী সাহেব এবং এই অঞ্চলেই তাঁহার আবাস-গৃহ। দেবব্রত তাঁহারই সন্ধান করিতে লাগিল। চারিদিকে শুধু বস্তি ও জীর্ণ বাড়ি-ঘর; কিন্তু সেই সবের মাঝে মাঝে এক একটা সুরম্য অট্টালিকা

উজ্জ্বল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে দূর হইতেও সেগুলি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে তাহারই একটা বাড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং দরোয়ানের হাতে চিঠি পাঠাইয়া দিয়া ব্যানার্জী সাহেবের বসিবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাকে দেখিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমিই কি সেদিন আমাকে হাসপাতালে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলে?

আজ্ঞে হাঁ।

সেই তেপান্তরের মাঠের মধ্যে তুমি কি করতে গিয়েছিলে?

পাখি শিকার করতে গিয়েছিলাম।

সঙ্গে আর কেউ ছিল?

অনেক লোক ছিল।

তারা সব কোথায় গিয়েছিল?

অনেক দূরে ছিল।

সাহেব বলিলেন, বেশ, তোমার ওপরে খুব খুশি হয়েছি, তোমায় এইগুলো বকশিশ দিলাম, বলিয়া কয়েকখানা নোট টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন।

দেবব্রতের দুই চক্ষু সহসা যেন জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, শুধু এই কারণেই কি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন? না, অন্য কোন কাজ আছে?

সাহেব তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত রইলেন। বলিলেন, না। কেন? টাকাগুলো নিতে চাও না? আচ্ছা বেশ, তোমায় ধন্যবাদ।

বোধ করি তাহাকে একটু শ্রদ্ধার চোখেই দেখিলেন। তাই সম্মুখের চেয়ারখানা দেখাইয়া দিয়া বসিতে বলিলেন। সে চেয়ারে বসিলে সাহেব বলিতে লাগিলেন, দেখ, সেদিনের ঘটনাটা কতই না তুচ্ছ। হঠাৎ মাঠের মধ্যে গাড়ি বিগড়ে গেল তাই, নতুবা কিছুই হ'ত না, কি বল?

দেবব্রত এ কথার উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, অতদূর মাঠের মধ্যে আপনি কেন গিয়েছিলেন?

সাহেব বলিলেন, একটু কাজ ছিল তাই যেতে হয়েছিল। কিন্তু দেখ অমন দামী গাড়ি হঠাৎ বিগড়ে যাবে, একথা কে ভাবতে পারে? তা ছাড়া সেদিন আমার এমন কিছু হয়ও নি, তাই কি না বল?

দেবব্রত জবাব দিল না, চুপ করিয়া রহিল। যত দোষ ঐ গাড়িখানার, নিজের কোনই দোষ নাই, এবং ঘটনাটাও অতিশয় তুচ্ছ, বারে বারে কেবল এ কথাই তিনি বুঝাইতে লাগিলেন। এই সামান্য লোকটি তাঁহাকে যে একদিন অমন অসহায় অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিল, এই লজ্জাই তাঁহাকে মর্ম্মান্তিক বিঁধিতে লাগিল। নিজের দুর্ব্বলতা এবং অসহায়

অবস্থা অপরের কাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে, ইহা যে ফ্যাশান নয়। তাই বারে বারে কেমন করিয়া ঘটনাটাকে তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দেবেন, তাহারই পথ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া বসিয়া শুনিতে লাগিল।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কলেজে পড়াশোনা কর ত?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কি পড়? সায়েন্স?

হ্যাঁ।

বেশ, তোমার ও'পরে খুব খুশি হয়েছি। তুমি মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো। আচ্ছা, এখন যেতে পার। বলিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন।

দেবব্রত যেমন বসিয়া ছিল, তেমনই নিঃশব্দে উঠিয়া আসিল।

রাস্তায় আসিয়া সে সাহেবের কথাগুলিই মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। কারখানার মালিক এই ব্যানার্জী সাহেবের ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতা কতই তো আছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি মানুষকে এমন তুচ্ছ করিয়াই দেখিতে হইবে? সেদিন সেই সুদূর মাঠ হইতে কত পরিশ্রম করিয়াই না তাঁহার অচেতন দেহটা সে লইয়া আসিয়াছিল, আর আজ ফিরিয়া আসিল সে অপমানের বোঝা লইয়া। কিন্তু তাহার মনে

কোন আক্ষেপ ছিল না। একদিন যে সে সামান্য উপকার করিতে পারিয়াছিল, সেই কথা স্মরণ করিয়াই সে তৃপ্তি পাইতে লাগিল। মনে ভাবিল, মনুষ্য-চরিত্রের এই যে একটা দিক আজ তাহার চোখে পড়িল, জীবনের এই অভিজ্ঞতা মন্দ কি ? ক্ষতি তো কিছুই নাই। সাহেব তাহাকে মাঝে মাঝে দেখা করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু সে তাঁহাকে উদ্দেশে নমস্কার জানাইল। মনে মনে বলিতে লাগিল, আর না, আর আমার দেখা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু সাহেবের সহিত তাহার আবার এক দিন দেখা হইয়াছিল।

৮

কলেজের দিনগুলি একটানা স্রোতের মতই নিরুপদ্রবে কাটিতেছিল। অধ্যাপকদের বক্তৃতা এবং ছাত্রদের তর্ক ও বিতর্ক লইয়া সহজ মন্থর গতিতে দিন চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সহসা তাহাতে বাধা পড়িয়া গেল। একদল অধ্যাপক ছাত্রদের সঙ্গে করিয়া চারিদিকের বিশিষ্ট স্থানগুলি, আর্ট গ্যালারি, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, কল-কারখানা প্রভৃতি দেখিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলেন। ছেলেদের শিক্ষার নিমিত্ত এই কাজ প্রতি বৎসরই তাঁহাদের করিতে হয়। ছাত্রেরাও কিছুদিনের জন্য হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। দল বাঁধিয়া সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই সব দেখিতে লাগিল। কয়েকদিন অন্যান্য স্থান দেখিয়া সর্ব্বশেষে তাহারা কারখানা অঞ্চলে প্রবেশ করিল।

রাজধানীর পূর্ব্ব অঞ্চলে বহুদূর ব্যাপিয়া অগণিত কল-কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে শুধু চোখে পড়ে কয়লার ধোঁয়া। ছোট, বড়, মাঝারি চিম্‌নিগুলি আকাশে দৈত্যের মতই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সরু সরু রাস্তা-গুলি ধূলাতে পরিপূর্ণ এবং তাহারই দুই পাশে অগণিত বস্তি ও জীর্ণ বাড়িঘর। মলিন ও শত ছিন্ন পোশাক পরা শ্রমিকদের

আসা-যাওয়া সর্ব্বক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ছেলের দল সেই ধূলিধূসর রাস্তা ধরিয়া চলিতে চলিতে ক্লান্তি বোধ করিতে লাগিল। তখনও বসন্তের হাওয়ার শেষ হয় নাই; গাছে গাছে রং ধরিয়াছিল। তাহারা গাছের ডাল টানিয়া, পাতা ছিঁড়িয়া তাহাদের পথ চলার ক্লান্ত মুহূর্ত্তগুলি সরস করিয়া তুলিতে লাগিল। অনেকগুলি কারখানা তাহারা দেখিল, অনেক উজ্জ্বল কলকব্জা ও যন্ত্রপাতির সহিত তাহাদের পরিচয় হইল। আর দেখিল, সেই যন্ত্র-দানবের সম্মুখে অসংখ্য নর-নারীর ঘর্ম্মাক্ত ক্লান্ত মূর্ত্তি, জীর্ণ মলিন বসন।

একজন অধ্যাপক এই কল-কারখানার অপকীর্ত্তির কথাই ছাত্রদের কাছে বলিতেছিলেন। কেমন করিয়া ইহা এক যন্ত্র-সভ্যতার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে; সহজ, শান্ত মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া কোথায় যে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে, তাহারই আভাস দিতে লাগিলেন।

ইহারই শেষদিনে দেবব্রত দল ছাড়া হইয়া একেলা একটা ভিন্ন পথ ধরিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল। তখন বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে, তাই সে দ্রুতপদে বাসার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এমন সময় পিছন হইতে তাহাকে কে যেন ডাক দিল, দেবব্রত! সে চাহিয়া দেখিল, একটা গাছতলা হইতে অরুণ তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। সে বিস্মিত

হইয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল জিজ্ঞাসা করিল, এখানে ব'সে আছ কেন অরুণ ?

একটু কাজ আছে, তাই ব'সে আছি।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, আবার কলেজে যাওয়া বন্ধ করেছ কেন ?

অরুণ বলিল, সময় পাই নি, তাই যেতে পারি নি।

এমন কি কাজ ছিল যে, এক সপ্তাহ কলেজে যেতে পার নি ?

সে সব কথা আর ব'লে কি লাভ, যাক, এদিকে তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?

কারখানা দেখতে।

কোন্ কারখানা ?

এই যে চারিদিকে এত কারখানা, এই সব। কদিন ধ'রে তো এই অঞ্চলেই ঘুরে বেড়াচ্ছি।

সঙ্গে আর কে ছিল ?

আমাদের সকলেই।—বলিয়া গত এক সপ্তাহ ধরিয়া যাহা যাহা দেখিয়াছে, সেই সব বলিতে লাগিল।

চলিতে চলিতে কথা হইতেছিল। নিকটেই মাঠের মধ্যে একটা দোতলা বাড়ির সম্মুখে আসিয়া অরুণ বলিল, বর্ত্তমানে

এইখানে আশ্রয় নেওয়া গেছে, চল দেখবে।—বলিয়া নীচের তলার একটা ঘরে তাহাকে লইয়া আসিল।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, আবার এখানে উঠে এসেছ নাকি ?

হ্যাঁ, সে মেসটা ছেড়ে দিয়েছি।

ছেড়ে দিলে কেন ?

এ পাড়ায় অনেক কাজ আছে, তাই বাধ্য হয়ে আসতে হ'ল।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এই বাড়ির সামনে সাইন-বোর্ডে কি একটা সমিতির নাম লেখা আছে, দেখতে পেলাম।

হ্যাঁ, এটা শ্রমিক-সমিতির অফিস।

কি হয় এখানে ?

অরুণ বলিল, শ্রমিকদের উন্নতির জন্যে যা যা দরকার, সেই সব করা হয়। চল, ওপরে যাই, দেখতে পাবে।—বলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া দোতলায় লইয়া অসিল। আফিস-ঘরের লোকদের সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দিল। সেক্রেটারি বাবু নিজে সঙ্গে করিয়া তাহাকে লাইব্রেরি ঘরে লইয়া আসিলেন। দেশী, বিদেশী অনেক বই, অনেক পত্রিকা দেখিতে দিলেন। দেওয়ালের গায়ে বিশিষ্ট শ্রমিকদের ফোটো টাঙানো

ছিল, সেই সব দেখাইতে লাগিলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নানাবিধ নির্যাতন ভোগ করিয়াছে, তাহাদের জীবন-বৃত্তান্ত একে একে বলিতে লাগিলেন। সামান্য লোক সে, তবু এক সম্মানীয় অতিথির মতই সমাদর পাইল এবং তাহাকে ঘিরিয়া একদল লোক কারখানা-জীবনের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, বিচার-অবিচারের কথা অনেকক্ষণ বলিতে লাগিল। এই সব কাহিনীর সহিত সে সম্পূর্ণ অপরিচিত, তাই নির্ব্বাক বিস্ময়ের সহিতই শুনিতে লাগিল!

অনেকক্ষণ পর যখন সে অরুণের সহিত নীচে নামিয়া আসিল তখন তাহার মন কেমন যেন নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এই অঞ্চলের পথঘাট সব আঁধার হইয়া আছে।

অরুণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর হাঁটিয়া আসিল, বলিল, অনেক কাজে জড়িয়ে পড়েছি, কোথাও যেতে পারি না, তোমার সঙ্গে যে দেখা করব, তারও সময় পাই না।

দেবব্রত অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, শিগগিরই কলেজে যেও, বেশি দেরি ক'রো না।

চেষ্টা করব, কিন্তু এখনও ঠিক বলতে পারছিনে।

অরুণ তাহাকে বড় রাস্তা অবধি পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া গেল। কিন্তু সে কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল।

পথের কাহিনী

বাস্তবের কঠিন পথের যে কাহিনী এই মাত্র সে শুনিয়া আসিল, তাহার প্রভাব তখনও সে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। বারে বারে কেবল সেই কথাই আলোচনা করিতে করিতে সে বাসায় ফিরিয়া আসিল।

৯

ইহার পর এক সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু অরুণ তখনও কলেজে আসে নাই। ছেলেবেলার বন্ধু বলিয়া দেবব্রত সর্ব্বদাই তাহার খোঁজখবর লইয়া থাকে। বিশেষ করিয়া অরুণের অদ্ভুত জীবন-যাত্রা তাহার মনে কৌতূহলের সৃষ্টি করে, এবং এই কারণেই সে সময় সময় তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়া বেড়ায়। সেদিনও সে মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তাই এক ছুটির দিনে সে তাহার খোঁজ লইবার উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু কে জানিত তখন যে, এমন এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লইয়া সে ফিরিয়া আসিবে, যাহা সারাজীবনেও ভুলিতে পারিবে না।

তখন দুপুর গড়াইয়া গিয়াছে, রৌদ্রতপ্ত পথে কেবল ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। অনেক পথ হাঁটিয়া সে আবার সেই কুলি-পাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু সেই সমিতি-গৃহের নিকটে আসিয়া সে যাহা দেখিল তাহাতে তাহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। দেখিল সম্মুখের অত বড় মাঠ লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে এবং পুলিশের লাল পাগড়ীতে লাল হইয়া উঠিয়াছে। রাস্তায় অগণিত লোকের ভিড়, দলে দলে কুলি মজুর সারি বাঁধিয়া, নিশান উড়াইয়া মাঠের দিকে অগ্রসর

হইতেছে। সঙ্গে তাহাদের কারখানার পোষাক, সেই জীর্ণ-মলিন বসন, ছেঁড়া পেন্টুলন, ছেঁড়া বুটজুতা।

দেবব্রত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিল। তারপর কি ভাবিয়া সেই ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল, এবং শোভাযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলিয়া চলিতে লাগিল। কখন যে লোকের ভিড় তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া মাঠের মাঝখানে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে তাহা সে অনুভব করিল না। কিন্তু যখন থামিয়া গেল, চারিদিকে চাহিয়া দেখিল যে এক বিশাল জন-সমুদ্রের মধ্যে সে ডুবিয়া আছে। সম্মুখে এক মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া এক ব্যক্তি বক্তৃতা দিতেছিলেন, তাঁহার সতেজ কণ্ঠস্বর সহসা তাহাকে সেই দিকে আকৃষ্ট করিল।

শ্রমিক-জীবনের দুর্দ্দশার কথা বর্ণনা করিয়া বক্তা বলিতে লাগিলেন, ভারবাহী জীবের মতই শুধু পরের বোঝা বহিয়া চলিয়াছি ; এ জীবনের মূল্য নাই, স্থায়িত্ব নাই। সারা জীবন বোঝা বহিয়া, ঐশ্বর্য্যের স্তূপ গড়িয়া দিয়া, ফিরিয়া আসি নিঃস্ব হইয়া—এমন ধারা সর্ব্বহারা জীব পৃথিবীতে আর কি আছে ?

তাঁহার কণ্ঠস্বরে এমন একটা মাদকতা ছিল, যাহার দরুন অত বড় জনতা নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। বিভিন্ন বক্তা তাঁহাদের দাবি-দাওয়ার কথা, অভাব-অভিযোগের কথা একে

একে বহুক্ষণ বলিতে লাগিলেন। ঝড়ে বাদলে আগুনে অপরিসীম পরিশ্রম করিয়া দিনের পর দিন কেমন করিয়া কাটিয়া যায়, সেই সব বর্ণনা করিতে লাগিলেন। দেবব্রত নিঃশব্দে শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়া গেল। তারপর সেই জনস্রোত আবার তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া মাঠের অপর প্রান্তে আনিয়া উপস্থিত করিল। আবার তাহারা দলে দলে নিশান উড়াইয়া কোলাহল করিয়া চলিতে লাগিল। সে ভিড় হইতে বাহির হইয়া আসিয়া একটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াইয়া সেই সব দেখিতে লাগিল।

কিন্তু কখন যে অলক্ষ্যে সে অপরের সীমানার মধ্যে পা দিয়াছে, সেদিকে খেয়াল ছিল না; হঠাৎ এক ব্যক্তির কণ্ঠস্বরে তাহার চমক ভাঙিয়া গেল। চাহিল দেখিল, সেই ব্যানার্জ্জী সাহেব তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার পরিধানে গল্‌ফ খেলার পোশাক। বোধ করি এই মাত্র খেলা সাঙ্গ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। পিছনে একটা বড় বাড়ির গেটের সম্মুখে তাঁহার মোটরগাড়ি অপেক্ষা করিতেছিল। বাড়িটা কোন কারখানার অফিসের মতই মনে হইতে লাগিল।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি?

দেবব্রত বলিল, কোথাও নিশ্চয়ই দেখেছেন।

ও, সেই যে টাকা দিতে চেয়েছিলাম, তুমি না নিয়ে চ'লে গিয়েছিলে, না ?

আমারও তো তাই মনে হচ্ছে।

তুমি কি লেবার-লিডার ?

আজ্ঞে না।

তবে এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

এমনই, এই সব দেখছি।

কি দেখছ ?

এই যে লোকজনের চলাফেরা, শোভাযাত্রা এই সব।

বক্তৃতা শুনেছিলে ?

শুনেছিলাম।

কি বলছিল ?

বলছিল যে, হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে যা নিয়ে তারা ফিরে আসে, তা অতি সামান্য। পাওনা তাদের অনেক বেশি।

হা হা হা হা—আর কি বলছিল ?

বলছিল যে, ভারবাহী জীবের মতই দিনের পর দিন খেটে যায়, আবার নিঃস্ব হয়েই একদিন পথে এসে দাঁড়ায়, তারা মানুষের মত বেঁচে থাকতে চায়।

হা হা হা হা—আর কি ?

বলছিল, তারা ধর্ম্মঘট করবে।

হা হা হা হা হা।—তারপর এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কলেজে পড়াশুনা করছ তো ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এত দূর কুলিপাড়ায় কি করতে এসেছিলে ?

একটু কাজ ছিল।

আচ্ছা, এখন তা হ'লে যাওয়া যাক।—বলিয়া তিনি গাড়িতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

দেবব্রতও আর অপেক্ষা করিল না, অরুণের ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং সম্মুখের মাঠও ফাঁকা হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু চলিতে চলিতে ব্যানার্জী সাহেবের উচ্চহাসি আবার তাহার কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল। মনে ভাবিল, এই যে এত লোক সমাগম, এত উদ্দীপনা, এমন ব্যাকুল নিবেদন, ইহা কি এমন করিয়াই হাসিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে ? এই বিশাল কারখানা-জগতে ব্যানার্জী সাহেবের আসন হয়তো অতি সামান্য, কিন্তু এই যে মনোভাব, ইহা তো তুচ্ছ করিবার নয়। কে জানে ইহার অন্ত কোথায়, ইহার মূল কত দূর ছড়াইয়া আছে, কোথায় গিয়া স্পর্শ করিয়াছে।

মনে মনে এই সব জল্পনা করিতে করিতে সে অরুণের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু অরুণের দেখা পাইল না।

ঘরের ভিতর একটি তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলে স্টোভ জ্বালাইয়া কি যেন রান্না করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া ছেলেটি নিজেই জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি অরুণদার খোঁজ করতে এসেছেন ?

হ্যাঁ, সে কোথায় গেছে বলতে পার ?

না, তবে তিনি এখুনি ফিরে আসবেন। আপনি বসুন।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, এখুনি যে ফিরে আসবে, তা তুমি কি ক'রে জানলে ? তার আসা-যাওয়ার কি কিছু ঠিক আছে ?

না, তবে তিনি শিগগিরই আসবেন, আমাকে কথা দিয়ে গেছেন।

দেবব্রত অগত্যা তাহার খাটিয়ার উপর আসিয়া বসিল। কতকগুলি খবরের কাগজ ও মাসিক পত্রিকা ইতস্তত ছড়াইয়া ছিল, সেইগুলি দেখিতে লাগিল। ছেলেটি মিথ্যা বলে নাই, অল্পক্ষণের মধ্যেই অরুণ ফিরিয়া আসিল এবং দেবব্রতকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এমন অসময়ে কি মনে ক'রে এসেছ ? বড্ড আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে।

দেবব্রত বলিল, এমনই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

অরুণ বলিল, বইপড়া বন্ধ ক'রে এতদূর এসেছ শুধু আমার সঙ্গে দেখা করতে, এ তো সহজ কথা নয়।

দেবব্রত ঈষৎ হাসিয়া বলিল, এখন পর্য্যন্ত কেন নিখোঁজ হয়েই আছ, তাই জানতে এলাম।

অরুণ বলিল, বেশ, খুব ভাল করেছ, তোমায় অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু কি করব, আমার স্বভাব তো বদলাতে পারি না। তারপর ছেলেটির দিকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ওটা কি হচ্ছে অজিত?

মাংস রান্না হচ্ছে দাদা।

মাংস? অমন উপাদেয় সাত্ত্বিক আহার ছেড়ে আজ আবার ও জিনিসটা ধরলে কেন?

জুটে গেল, কি করি, ফেলে দিতে তো পারি না। কিন্তু আপনি না খেয়ে চ'লে যাবেন না যেন।

অরুণ বলিল, মাংস না খেয়ে কেউ কি কখন, চ'লে যায়?

অজিত বলিল, আর কেউ যায় কি না জানি না; কিন্তু আপনাকে বিশ্বাস নেই। তারপর দেবব্রতের দিকে চাহিয়া বলিল, আপনাকেও কিন্তু খেতে হবে দাদা, নিমন্ত্রণ রইল।

দেবব্রত ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তা যেন রইল, কিন্তু নিমন্ত্রিতের সংখ্যা বেশি হ'লে তোমায় তো অসুবিধায় পড়তে হবে।

কিছু অসুবিধা হবে না, আপনি না খেয়ে যাবেন না।

ছেলেটির কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারে এমন একটি মাধুর্য্য আছে, যাহার দরুন লোকের মন সহজে আকৃষ্ট হয়।

অরুণ বলিল, কষ্ট ক'রে এতদূর যখন এসেছ, তখন আজ রাতটাও এখানে থেকে যাও।

দেবব্রত বলিল, কি হবে সারারাত এখানে থেকে?

এই প্রসিদ্ধ কুলিপাড়াটি একবার স্বচক্ষে দেখে যাও।

কি আছে দেখবার?

বিশেষ কিছুই নেই, তবে কেমন ক'রে এই সব লোক জীবন যাপন করে, তাদের বাড়িঘর সুখস্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি দেখে যাও।

দেবব্রত বলিল, রাত্রিবেলা কিছুই তো দেখা যাবে না।

অরুণ বলিল, খুব দেখা যাবে, এসব স্থানের দিন ও রাত্রিতে বিশেষ প্রভেদ নেই।

দেবব্রত উত্তর দিল না, অনুরোধ রক্ষা করিবে কি না, তাহাও বুঝা গেল না।

মাংস রান্না হইল এবং তিনজনে বসিয়া বসিয়া তাহা উদরস্থ করিল। অরুণ বলিল, চল, এবার যাওয়া যাক।

দেবব্রত অনিচ্ছাসত্ত্বে রাজী হইল, বলিল, শিগগিরই ফিরে আসতে হবে কিন্তু, বেশি দেরি ক'রো না।

অরুণ বলিল, না, শিগগিরই ফিরে আসবার চেষ্টা করব, বলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

কুলিপাড়ার একটা সরু রাস্তা ধরিয়া দুইজনে চলিতে

লাগিল। চারিদিকে অসংখ্য বস্তি, অগণিত লোকের বসবাস। তখনও রাত্রি গভীর হয় নাই, প্রতি ঘরে মৃদু আলো জ্বলিতেছিল। অন্ধকারে যেন শত শত জোনাকী-পোকা মিটি মিটি জ্বলিতেছে এমনই মনে হইতে লাগিল। কোথাও, গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য কুঁড়েঘর ইতস্তত ছড়াইয়া রহিয়াছে এবং তাহারই ভিতর এক একটি কুলি-পরিবার আশ্রয় লইয়া আছে। কোথাও বা শ্রেণীবদ্ধ টিনের চালা বহু অংশে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন দেশীয়, বিভিন্ন ভাষার ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকেদের আশ্রয় দিয়া এক বিশ্বপরিবারের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। চারিপাশে আবর্জ্জনাময় স্থান এবং দুর্গন্ধময় ড্রেন সমস্ত কুলিপাড়ার শোভা বর্দ্ধন করিয়া আছে। তখনও কোলাহল নিস্তব্ধ হয় নাই, মাঝে মাঝে বেসুরা রাগিণী ও অট্টহাসি কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল।

এক স্থানে অনেক লোক ভিড় করিয়াছিল, স্ত্রী-পুরুষ, ছেলেমেয়ে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, ওখানে এত লোক কেন ?

অরুণ বলিল, একটু প্রয়োজন আছে তাই।

বিকেলবেলার শোভাযাত্রা এখনও বোধ করি ভাঙে নি।

না, তা নয়, কিছু সাহায্য পাবার আশা আছে, তাই অপেক্ষা করছে।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, কেন, ওরা কি কারখানায় কাজ করে না?

অরুণ বলিল, করত, কিন্তু কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে, তাই তো এত গোলমাল চলছে।

কিন্তু এত রাত্রে কে ওদের সাহায্য করবে?

করবে কোন সমিতি, কি কোন ব্যক্তিবিশেষ, যারা ইচ্ছা রাখে।

দেবব্রত বলিল, কিন্তু এ কি অবস্থা যে এত রাত্রে স্ত্রী, পুরুষ, ছেলে, মেয়ে হাত ধরাধরি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে!

অরুণ কহিল, এ পাড়ায় এসব এমন কিছু নতুন নয়, মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া ক'রো, তা হ'লেই বুঝতে পারবে।

দেবব্রত চুপ করিয়া রহিল। অরুণ কয়েক মুহূর্ত্ত পরে পুনরায় বলিল, আরও একটা জিনিস চোখে পড়বে, সেটা হচ্ছে ব্যাধির ভয়াবহ মূর্ত্তি। কলেরা, বসন্ত, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি যত প্রকার রোগ আছে, সবগুলোর পীঠস্থান এই কুলিপাড়া।— বলিয়া নিজের কথায় সে নিজেই হাসিয়া উঠিল। তারপর কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল, বর্ত্তমানে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারীরূপে দেখা দিয়েছেন, হাসপাতালে রোগীর স্থান হয় না, তাই কিছু বিব্রত হয়ে পড়েছি, মাঝে মাঝে রাত জেগে কাটাতে হয়।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, আজও কি রাত জাগবার সম্ভাবনা আছে ?

এখনও ঠিক বলতে পারছি না, অসম্ভব নয়।

কিছু দূর হাঁটিয়া আসিয়া, একটা বাগান-বাড়ির সম্মুখে আসিয়া অরুণ বলিল, এটা একটা হাসপাতাল।

দেবব্রত কহিল, কিন্তু তেমন তো মনে হচ্ছে না।

না হবারই কথা, সদাশয় ডাক্তারবাবু তাঁর এই বাগান-বাড়িতে রোগীদের থাকতে দিয়েছেন তাই এটা একটা ছোট-খাটো হাসপাতাল হয়ে উঠেছে। তিনি নিজেই তুবেলা ওষুধ দিয়ে যান।

কে এই ডাক্তারবাবু ?

তুমি তাঁকে চিনবে না, এই দিকেই তাঁর বাড়ি। কিন্তু অমন মানুষ আর হয় না।—বলিয়া উদ্দেশে তাঁহাকে নমস্কার করিল।

তুইজনে সেই বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল। দেবব্রত দেখিল, ছোট ছোট কয়েকখানি ঘর লোকে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। রোগীদের অনেকেই সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাই একদিকে গাঁটরি-পেঁটরা ও হাঁড়ি-কলসী এবং অপর দিকে খাটিয়ার উপর রোগীর কাতরোক্তি। সে এক অভিনব দৃশ্য ! কয়েকটি অল্পবয়স্ক ছেলে সেই সব রোগীদের পরিচর্য্যায়

নিযুক্ত ছিল। এক দিকের একটা ছোট ঘরে অজিতের সঙ্গে তাহাদের দেখা হইল।

অরুণ জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কখন এলে অজিত?

অজিত বলিল, এই তো সবে এলাম।

ডাক্তারবাবু এসেছিলেন?

না, তিনি বোধ হয় আজ আসবেন না।

তবেই তো মুশকিল, তাঁকে একটা খবর দিলে হয় না?

আজ আর তাঁকে কষ্ট দেবার দরকার নেই।

কিন্তু রোগীদের অবস্থা তো ভাল বোধ হচ্ছে না।

না হোক, কিন্তু তিনি ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছেন, আর এতগুলো ভলান্টিয়ার আছে, তাতেই কাজ হয়ে যাবে।

ভলান্টিয়াররা কি করবে?

কিছু না করুক, তবু তাদের দেখে যমরাজার অনুচরদের কিন্তু অসুবিধাও তো হতে পারে, আজ রাতটা কাছে না আসতেও পারে।

অরুণ ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কতক্ষণ থাকবে?

অজিত বলিল, বেশিক্ষণ থাকব না।

আচ্ছা, আমি ফিরে আসব, তুমি ওষুধগুলি ঠিক ক'রে রেখে যেও।—বলিয়া দেবব্রতকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

পথের কাহিনী

রাস্তায় আসিয়া দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, এখন আবার কোথায় যাবে ?

অরুণ বলিল, চল তো দেখতে পাবে।

তারপর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আবার একটা ভাঙা দোতলা বাড়ির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, এই সব ইষ্টকালয়গুলি এককালে বাগান-বাড়ি ছিল, কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তনে এখন পরিত্যক্ত লোকালয় এবং ক্রমশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে চলেছে। কেবল রাত্রিবেলা নিরাশ্রয়দের আশ্রয় দান করে।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, এমন ভাঙা বাড়িতেও কি লোকে বাস করতে আসে ?

আসে বইকি, যাদের কিছুই নেই, তারাই আসে। সারারাত মাথা গুঁজে প'ড়ে থাকে এবং ভোরবেলা বেরিয়ে যায়।

বাড়িটার নীচের অংশ নিবিড় অন্ধকার এবং আগাছা জন্মিয়া দুর্ভেদ্য হইয়া আছে। বাহিরের একটা কাঠের সিঁড়ি ধরিয়া অরুণ দোতলায় উঠিয়া আসিল। ঘরের মধ্যে একদল স্ত্রী পুরুষ ভিড় করিয়া বসিয়া আছে, এবং তাহাদের চারিদিকে কতকগুলি ছোট ছেলেমেয়ে অসম্ভব কোলাহল করিতেছিল। এক কোণে একটা কেরোসিনের ডিবা মিটিমিটি জ্বলিতেছিল।

অরুণকে দেখিয়া লোকগুলি ছুটিয়া আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল। বলিল, বাবু পয়সা দাও, খেতে দাও। যেন ইহা তাহাদের দাবি, এমনই করিয়া চাহিতে লাগিল।

অরুণ জিজ্ঞাসা করিল, কেন আজ তোমাদের কিছুই জোটে নি ?

না বাবু, কোথাও কিছু পাই নি। তোমার অপেক্ষায় ব'সে আছি।

আমি এত পয়সা কোথায় পাব ? প্রতিদিন কেউ কখন দিতে পারে ?

কি করব বাবু, তুমি ছাড়া আর কে আছে বল ?

অরুণ পকেট হইতে কতকগুলি পয়সা বাহির করিয়া তাহাদের দিয়া বলিল, আজ দিলাম, কিন্তু কাল আর পারব না।

বাবু, আজ তো ছেলেমেয়েগুলো বাঁচুক, কাল আবার চেষ্টা ক'রে দেখব।

অরুণ আর অপেক্ষা করিল না। ঘর হইতে বাহির হইয়া নীচে নামিয়া আসিল। দেবব্রত এতক্ষণ নির্ব্বাক হইয়াই সমস্ত দেখিতেছিল। এইবার বলিল, অরুণ, আর আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারব না।

অরুণ জিজ্ঞাসা করিল, যেতে পারবে না কেন ? এখনও যে অনেক জায়গায় যেতে হবে।

তা হোক, তুমি একাই ঘুরে এস, আমি এইখানে অপেক্ষা করি।

তাও কি হয়, তোমায় এখানে ফেলে রেখে আমি চ'লে যাব ?

খুব হয় অরুণ, আমার কোন অসুবিধে হবে না।—বলিয়া রোয়াকের উপর বসিয়া পড়িল।

অরুণ তবু বলিল, চল যাই, শিগগির না হয় ফিরে আসা যাবে।

না, তুমি কাজ সেরে এস, আমি এই দিকেই অপেক্ষা করতে থাকব।

অরুণ অগত্যা চলিয়া গেল। দেবব্রত বসিয়া বসিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। তারপর উঠিয়া আবার সেই কাঠের সিঁড়ি ধরিয়া উপরে গেল। নিকটেই ঘরের দোরগোড়ায় এক ব্যক্তি বসিয়া ছিল, সে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং পকেট হইতে গোটাকতক টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল।

লোকটি উঠিয়া কিছুক্ষণ অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর জিজ্ঞাসা করিল, এই টাকাগুলো কি আমাদের দিলেন ?

হ্যাঁ, দিলাম।

সত্যি দিলেন তো ?

সত্যি দিলাম।

আবার ফিরিয়ে দিতে হবে না তো ?

না, ফিরিয়ে দেবার কথা তো বলি নি।

একেবারেই দিয়ে দিলেন ?

তাই তো দিলাম। কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না ?

না বাবু, এমন তো কেউ কখনও দেয় না।—বলিতে বলিতে লোকটির চক্ষু যেন সজল হইয়া আসিল। টাকা কয়টা হাতে করিয়া সে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। কিন্তু দেবব্রত আর অপেক্ষা করিল না, নীচে আসিয়া আবার সেই রোয়াকের উপর বসিয়া পড়িল।

কিন্তু অল্পক্ষণ পরে উপর হইতে সমস্ত লোক নামিয়া আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। কেহ পিছনে, কেহ ডাহিনে, কেহ বামে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল, কেহ বা নীচে পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল, এবং কেমন করিয়া তাহাদের এই দুর্দ্দশার শুরু হইল, সেই কথাই বলিতে লাগিল। কে কোন্ কারখানায় কত বৎসর চাকরি করিয়াছে এবং অকস্মাৎ কেনই বা তাহা শেষ হইয়া গেল, কাহার প্রিয়জন কলের চাকায় পিষিয়া গিয়াছে, কোন্ উপরওয়ালা কত অত্যাচার করিয়াছে, এইসব কথা বহুক্ষণ ধরিয়া সবিস্তারে বলিতে লাগিল। একজন বৃদ্ধ বলিল, বাবু, তোমার দেওয়া টাকা ক'টা দিয়ে বড্ড উপকার হয়েছে।

কাল আমরা এখান থেকে চ'লে যেতে পারব। দুমাস ধ'রে ব'সে থেকে সম্বল যা ছিল সবই তো শেষ হয়ে গেছে, কোথাও গিয়ে যে চেষ্টা করব, তারও উপায় ছিল না।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, কাল কোথায় চ'লে যাবে?

কিছু ঠিক নেই। দেখব, আবার কোন কারখানা, কি কোন কয়লার খাদে কাজ পাই কি না।

সে বসিয়া বসিয়া তাহাদের জীবন-ভরা দুর্দ্দশার কাহিনী অনেকক্ষণ শুনিয়া গেল, তারপর তাহার কেমন যেন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তাই সে এক সময়ে উঠিয়া ভিড় হইতে বাহির হইয়া আসিল।

তখন রাত্রি গভীর হইয়া পড়িয়াছে। কোথাও সাড়া নাই, শব্দ নাই, রাস্তায় লোক-চলাচল নাই। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে চারিদিকে স্নিগ্ধ আলো ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে কিছুক্ষণ সেই জনহীন পথে অরুণের অপেক্ষায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তারপর কি ভাবিয়া আবার সেই হাসপাতালে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং যে ঘরে অজিত ছিল, সেই ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিল, অজিত নাই; কিন্তু ঘরের ভিতর একটি রোগী যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে এবং একটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক তাহার শিয়রের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে।

দেবব্রতকে দেখিয়া স্ত্রীলোকটি বলিল, বাবু, আজ রাতটা কি তুমি এখানে থাকবে?

সে জিজ্ঞাসা করিল, কেন, আর কেউ নেই?

না বাবু, কেউ নেই। রোগীর অবস্থাও ভাল বোধ হচ্ছে না।

ওষুধ দিয়ে গেছে?

দিয়ে গেছে, কিন্তু এখনও খাওয়াতে পারি নি।

দেবব্রত রাজি হইল। এক দাগ ঔষধ ঢালিয়া রোগীকে খাওয়াইয়া দিল। তারপর ঘরের এক কোণে একটা টুল ছিল, তাহার উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু রোগীর কাতরোক্তি তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। তাই সে কিছুক্ষণ পরে বাহির হইয়া আসিল। পাশের ঘরগুলি সব নিস্তব্ধ। ভলান্টিয়ারের দল তন্দ্রার ঘোরে ঢুলিয়া পড়িয়াছে। সে অনেকক্ষণ বাহিরে কাটাইয়া দিয়া আবার ঘরে আসিয়া বসিল।

স্ত্রীলোকটি বলিল, বাবু, গেল বছর ছেলেটি মারা গেল, আবার এই বছর লোকটির এই অবস্থা। কি হবে কে জানে? একটা চাকরি ছিল, তাও গেছে।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, চাকরিটা গেল কেন?

সে অনেক কথা, ব'লে-আর কি হবে!

ছেলেটা কি ক'রে মারা গেল?

কারখানার দুর্ঘটনায়ই মারা গেছে।

দিন কেমন ক'রে চলে?

স্ত্রীলোকটি বলিল, নিজে এই বয়সে একটা চাকরি নিয়েছি, সারা দিন বোঝা টেনে বেড়াই, তাই দিয়ে কোনমতে চলে।

দেবব্রত পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, লোকটির চাকরি কেন গেল, সে কথা তো বললে না।

স্ত্রীলোকটি প্রথমে জবাব দিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, সে কথা কি তুমি বুঝবে? চাকরি কোন দিন করেছ?

না।

ওপরওয়ালা কেমন ক'রে অত্যাচার করে জান?

না।

তবে তোমাকে কি ক'রে বোঝাব! অত্যাচারী ওপর-ওয়ালার বিষ-নজরে যদি পড়তে, তবেই সব বুঝতে। চাকরি যেতে মোটেই দেরি হয় না। ছলে, কৌশলে, মিথ্যে ক'রে শেষ ক'রে ছেড়ে দেয়।—বলিয়া সে চুপ করিল। বোধ করি বেশি কথা বলিবার ইচ্ছা তাহার হইতেছিল না।

দেবব্রতও আর প্রশ্ন করিল না, অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। রোগীর অবস্থাও ক্রমশ যেন ভাল বোধ হইতে লাগিল। তাই সে আবার বাহিরে আসিয়া দোরগোড়ায় বসিয়া পড়িল। বসিয়া বসিয়া আজিকার ঘটনাগুলিই সে

মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। কুলিপাড়ার সেই জীর্ণ বাড়িঘর, সেই শোভাযাত্রা, সেই অনাহারী নরনারী, সব যেন আবার তাহার চোখের সম্মুখে ভিড় করিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। এইভাবে কতক্ষণ যে কাটিয়া গেল ঠিক নাই, এবং অলক্ষ্যে কখন যে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, তাহাও সে অনুভব করে নাই। এমন সময় হঠাৎ অরুণ আসিয়া উপস্থিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি এইখানেই সারা রাত ব'সে আছ?

দেবব্রত বলিল, তাই তো আছি।

আর আমি ভাবছিলাম, তুমি ফিরে চ'লে গেছ।

ফিরে চ'লে যাব, তা তো তোমায় বলি নি।

না, তা বল নি। তবে খুব অসুবিধে হয়েছে নিশ্চয়ই।

না, এমন কিছু অসুবিধে হয় নি, কিন্তু তুমি এত দেরি করলে কেন?

কি করব বল, তোমার মতই আমাকেও সারা রাত পাহারা দিতে হয়েছে, ফেলে আসতে তো পারি না।

বেশ করেছ, কিন্তু এখন আর কি কাজ বাকি আছে?

বিশেষ কিছু নেই, তবে তুমি বাসায় ফিরে যাও, আর দেরি ক'রো না। ভোর হয়ে এসেছে।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, আর তুমি ?

অরুণ বলিল, আমার যেতে দেরি হবে।

দেবব্রত আপত্তি করিল না। অরুণ তাহাকে সঙ্গে করিয়া বড় রাস্তা অবধি পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া গেল। তখন পূব-আকাশ সবে লাল হইয়া উঠিয়াছে। অকস্মাৎ এই ভোরের আলো তাহার চোখে কেমন যেন নূতন ঠেকিল। যেন অন্ধকার পাতাল-পুরী হইতে এইমাত্র বাহির হইয়া আসিয়া সে দিনের আলোর সন্ধান পাইয়াছে। রাস্তা দিয়া একদল কুলি-মজুর হাঁটিয়া চলিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া থামিয়া গেল, নমস্কার করিয়া বলিল, বাবু, আজ আমরা চললাম।

সে দেখিল, গত রাত্রের সেই লোকগুলি, যাহারা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল। ভোর না হইতেই তাহারা দল বাঁধিয়া রওনা হইয়াছে।

সে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় চলেছ ?

কিছু ঠিক নেই বাবু, দেখব, আবার কোথাও কোন কাজের সন্ধান পাই কি না। কিন্তু তোমার কথা কোন দিন ভুলব না—জীবনেও ভুলতে পারব না।

সে চুপ করিয়া রহিল। লোকগুলি আবার তাহাকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। সে সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে ভাবিল, কে

জানে ইহারা কোথায় যাইবে, কত গাছতলায়, কত নদীর ধারে কতদিন কাটিবে, তাহাই বা কে বলিবে ?

সে আবার চলিতে আরম্ভ করিল। পথে অজিতের সঙ্গে দেখা হইল। সে হাত তুলিয়া বলিল, সুপ্রভাত দাদা, এই কি বাসায় ফিরে যাচ্ছেন ?

হ্যাঁ, তুমি কোথায় চলেছ ?

কারখানায় যাচ্ছি।

কোন্ কারখানা ?

ঐ যে বড় কারখানাটা দেখা যাচ্ছে, ঐখানেই কাজ করি কিনা।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, কখন ফিরবে ?

অজিত বলিল, ফিরব অনেক বেলায়, কিন্তু এখন যাই দাদা, আবার একদিন দেখা হবে।—বলিয়া সে চলিয়া গেল।

তাহার সুশ্রী দেহটা কারখানার মলিন পোশাকে অদ্ভুত দেখাইতেছিল।

দেবব্রত আবার হাঁটিতে লাগিল। একলা পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু রাজধানীর রাস্তাগুলি তাহার চোখে কেমন যেন অচেনা হইয়া গিয়াছে। দুই পাশের বাড়ি-ঘর, দালান-কোঠা সবই যেন কঠিন প্রস্তরের মতই মনে হইতে লাগিল।

১০

ইহার পর কয়েক মাস অতীত হইয়া গেল, দেবব্রত আর অরুণের সহিত বাহির হয় নাই। পরীক্ষার বইগুলিই তাহাকে সর্ব্বদিক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

বর্ষাকাল, মেঘের ভারে আকাশ ভারী হইয়া আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাটা শেষ হইয়া গেল, সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। অরুণ শেষের কয়েক মাস কলেজে আসিয়া অনেক পরিশ্রম করিয়াছিল এবং তাহার ফলে হয়তো সে পাস করিয়া যাইবে, ইহাই সকলে আশা করে। পরীক্ষার পর কেবল একদিন সে দেবব্রতর সঙ্গে দেখা করিয়াছিল, তারপর আর তাহার সন্ধান নাই।

পরীক্ষা-শেষে দেবব্রত মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছিল, কিন্তু তাহার অবসরময় দিনগুলি ক্রমশ যেন অচল হইয়া উঠিতে লাগিল। সেদিন কুলিপাড়া হইতে যে অভিজ্ঞতা লইয়া সে ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহা সে এখনও ভুলিতে পারে নাই। তাহার কৌতূহলী মন আবার তাহাকে সেই পথে টানিয়া লইতে চাহিল। তাই সে আবার অরুণের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ কুলিপাড়ার বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান

করিল, কিন্তু তাহার দেখা পাইল না। কোথায় যে সে চলিয়া গিয়াছে, কেহ তাহা বলিতেও পারিল না। অবশেষে সে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবার উপক্রম করিতে লাগিল। তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এবং অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। সে বর্ষাতি দিয়া দেহটা ঢাকিয়া লইল। সেই কারখানা-অঞ্চলের একটা সরু রাস্তা ধরিয়াই সে হাঁটিয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে কে যেন তাহাকে ডাক দিল, দাদা! সে চাহিয়া দেখিল, রাস্তার ধারে একটা গাছের তলায় অজিত দাঁড়াইয়া আছে। সে খুশি হইয়া নিকটে আসিল। তাহার সহিত একটি সতরো-আঠারো বৎসরের মেয়েও অপেক্ষা করিতেছিল। চেহারা দেখিলে তাহাকে অজিতের ভগ্নী বলিয়াই নিশ্চিত অনুমান হইবে। নাম—কল্যাণী। মাথার উপরে ঝাঁকড়া একটা ফুলের গাছ, অসংখ্য লাল ফুল ফুটিয়া আছে, এবং তাহারই নীচে ভাই বোনে দাঁড়াইয়া সমস্ত স্থানটা যেন আলো করিয়া রাখিয়াছে।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, এখানে দাঁড়িয়ে কেন অজিত?

অজিত বলিল, আপনাকে আসতে দেখে অপেক্ষা করছিলাম।

কিন্তু বৃষ্টির জলে জামা কাপড় যে তোমার ভিজে যাচ্ছে।

বেশি ভিজবে না, কিন্তু আপনি এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

অরুণের খোঁজ করতে এসেছিলাম, সে কোথায় গেছে বলতে পার ?

অরুণদা ? তিনি তো এখানে নেই।

কোথায় গেছে ?

অনেকদিন হ'ল দেশে চ'লে গেছেন।

দেশে গেছে ? কিন্তু এখনও তার একটা বাসা এইদিকেই আছে, আমি খোঁজ নিয়ে এলাম।

অজিত বলিল, হ্যাঁ, সেই বাসায়ই তো আমরা থাকি।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, কতদূর সে বাসা ?

বেশি দূর নয়, খুব কাছে। যাবেন সেখানে ?

আজ নাই বা গেলাম, ফিরতে রাত হয়ে যাবে।

বেশি রাত হবে না, একটু বিশ্রাম ক'রে ফিরে আসবেন।

অরুণ যখন নেই, তখন আর গিয়ে কি লাভ ?

অরুণদা নেই ব'লেই কি যেতে নেই ?

দেবব্রত ঈষৎ হাসিল, তারপর এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা, চল যাই।

তখন সামান্যই বৃষ্টি পড়িতেছিল, সে চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিল, তোমায় এত রোগা দেখাচ্ছে কেন ?

বড্ড অসুখ করেছিল।

কি অসুখ করেছিল ?

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল, কিন্তু এখন ভাল হয়ে গেছি।

এদিকে কোথায় গিয়েছিলে ?

হাসপাতালে গিয়েছিলাম, দিদি নিয়ে গেল তাই।

দিদি নিয়ে গেল কেন ?

অসুখ সেরে গেছে, তবু নাকি ওষুধ খেতে হবে।

মেয়েটি এতক্ষণ চুপ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া আসিতেছিল, এইবার বলিল, ডাক্তার বলেছেন, এখনও ঠিকমত সারে নি, অনেকদিন ওষুধ খেতে হবে।

অজিত বলিল, না দাদা, একেবারে ভাল হয়ে গেছি, কোন ভাবনা নেই।

দেবব্রত বলিল, ভাবনা না থাকলেই ভাল, কিন্তু ডাক্তারের কথা অমান্য ক'রো না অজিত। এই অসুখের পর কুলিপাড়ায় যেন রাত জাগতে যেও না।

অজিত বলিল, না, সেখানে আর যাই নি।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের সেই ঘরটা, যেখানে মাংস রান্না করেছিলে, সেটা ছেড়ে দিলে কেন ?

অজিত বলিল, অরুণদার ইচ্ছে হ'ল ছেড়ে দিলেন, আমার তো কোন হাত নেই।

নিকটেই গলির মধ্যে একটা ছোট বাড়ির সম্মুখে আসিয়া অজিত বলিল, এইটে অরুণদার বাসা, চলুন, ওপরে যাই।—

বলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া দোতলায় লইয়া আসিল। বাড়িটা অতিশয় ছোট। নীচের তলায় আলাদা ভাড়াটে। একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক সপরিবারে বাস করিতেছিলেন এবং উপরের অংশটা অরুণ ভাড়া লইয়াছিল।

অজিত ঘরে ঢুকিয়া বাতি জ্বালিল এবং একখানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া দেবব্রতকে বসিতে দিল। দেবব্রত গায়ের ভারী কোটটা খুলিয়া রাখিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিল। বাহিরে বৃষ্টিপাত এতক্ষণ থামিয়াছিল, কিন্তু এইক্ষণে আবার তাহা প্রবল বেগে আরম্ভ হইল।

অজিত বলিল, অসুখ যেদিন চেপে ধরল, দিদিকে একখানা চিঠি ফেলে দিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। তিন চার দিন কি ক'রে কেটে গেল টের পাই নি, দিদি না এলে এ যাত্রা হয়তো বাঁচতাম না।

দেবব্রত বলিল, আমাকে একটা খবর দিলেও তো পারতে।

অজিত বলিল, সেদিন আর আমার কোন দিকে খেয়াল ছিল না।

কল্যাণী এতক্ষণ চুপ করিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া ছিল, এইবার বলিল, অজিতের চাকরি কেন গেল, একবার জিজ্ঞেস করুন।

দেবব্রত অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার চাকরিও গেছে অজিত ?

হ্যাঁ দাদা, আর কারখানায় যেতে হয় না।

কেন গেল ?

কেন, তা আপনাকে কি ক'রে বোঝাব! তাদের খুশি আমায় রাখবে না।

তোমার কি কোনই অপরাধ ছিল না ?

অপরাধ ? যথেষ্টই ছিল।

কি অপরাধ ছিল ?

সেই সমিতির জন্যে চাঁদা সংগ্রহ ক'রে বেড়াতাম, ভলান্টিয়ারি করতাম, এসব কি কম অপরাধ ?

শুধু এই কারণেই চাকরি গেল ? এমনও কি হয় ?

অজিত বলিল, খুব হয়, এসব তারা চায় না, সুচক্ষেও দেখে না।

দেবব্রত কিছুকাল নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল, তারা কি তোমায় কিছুই দেবে না, এতদিন কাজ করেছ ?

অজিত বলিল, তাদের আইনে যা পাওনা ছিল, সবই তো দিয়ে দিয়েছে।

এখন তা হ'লে কি করবে ?

কি করব তাই ভাবছি, ভাবনা ধ'রে গেছে।

কিন্তু জবাব দিল কল্যাণী। বলিল, মিথ্যে ক'রে তারা যদি চাকরি নিয়েই থাকে, নিক না, ভাবনা কি তাতে ?

অজিত বলিল, আবার একটা আশ্রয় কোথায় পাওয়া যাবে, সেই কথাই ভাবছি।

কল্যাণী বলিল, এসব তো আমাদের জীবনে এমন কিছু নতুন নয়, কতবারই তো ঘ'টে গেছে। তাই ব'লে কি অন্যায়-অবিচারের সম্মুখে সবল হয়ে দাঁড়াতে হবে না? তারপর দেবব্রতকে জিজ্ঞাসা করিল, এই সব কাজ করার দরুন শাস্তি যদি তারা দেয়ই, তাই ব'লে কি ভাবতে হবে?

দেবব্রত বলিল, না, ভেবে আর কি লাভ হবে!

কল্যাণী কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, মিথ্যার কখনও জয় হয় আপনি বলতে পারেন?

দেবব্রত কহিল, কখনও যে হয় না, এমন কথাই বা কি ক'রে বলি!

কল্যাণী বলিল, আমার কিন্তু মনে হয় না। নিজের মনের এই বিশ্বাস নিয়ে সবল হয়ে যারা চলে, জয় তাদের হবেই, তা যতদিন পরেই হোক।

দেবব্রত চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু কল্যাণীর এই নির্ভীক উক্তি শুনিয়া তাহার চমক লাগিয়া গেল। চোখ দুইটি তাহার অতিশয় উজ্জ্বল, কথা বলিবার সময় তাহা আরও যেন প্রখর হইয়া উঠিতেছিল।

কল্যাণী পুনরায় বলিতে লাগিল, আজ যদি দুর্দ্দিন এসে

ঘিরেই ধরে, ধরুক না, ভয় কি তাতে? তাই ব'লে কি নত হয়ে চলতে হবে?

অজিত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, দাদা, আজ আমাদের একটা অনুরোধ আপনাকে রাখতে হবে।

কি অনুরোধ?

কিছু খাবার জিনিস তৈরি আছে, আপনাকে তার ভাগ নিতে হবে।

দেবব্রত হাসিয়া উঠিয়া বলিল, কিছু আপত্তি নেই, তুমি নিয়ে এস।

কল্যাণী একখানা ছোট টেবিল তাহাদের সম্মুখে আনিয়া তাহার উপর রঙিন কাপড় পাতিয়া দিল। তারপর খাবার জিনিসগুলি পরিষ্কার করিয়া সাজাইয়া দিল।

আহারে বসিয়া অজিত বলিল, দাদা, কাল আমরা দেশে যাচ্ছি।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় তোমাদের দেশ?

অজিত বলিল, অনেক দূরে, এক ছোট শহরে।

কে আছে সেখানে?

কেউ নেই।

তবে কি করতে যাবে?

এমনই বেড়াতে যাব।

সেখানে বুঝি তোমাদের বাড়িঘর আছে?

অজিত বলিল, বাড়িঘর যে অনেক জিনিস, এত কোথায় পাওয়া যাবে?—বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

দেবব্রত চুপ করিয়া রহিল। অজিত বলিল, আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে দাদা? কিন্তু এমন হয়, সকলেরই তো সব জিনিস থাকে না। তারপর বসিয়া বসিয়া তাহাদের জীবনের একটা অধ্যায় তাহার কাছে বলিয়া গেল।

আহার শেষ করিয়া দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, কালই কি চ'লে যাবে?

অজিত বলিল, হ্যাঁ, এই বাসাটা ছেড়ে দিতে হবে কিনা।

আবার কবে ফিরে আসবে?

কিছু ঠিক নেই, তবে মনে হচ্ছে শিগগিরই ফিরতে হবে।

বাহিরের বৃষ্টিপাত তখন থামিয়াছিল, দেবব্রত কিছুকাল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল, এইবার তা হ'লে যাওয়া যাক, কি বল? অনেক রাত হয়ে গেছে। তারপর তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া সে নামিয়া আসিল। অজিত তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। নীচে আসিয়া দেবব্রত কহিল, আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

কি অনুরোধ?

ফিরে এসে আমার সঙ্গে একবার দেখা করবে?

ফিরে যদি আসি তবেই তো দেখা করব ?

ফিরে এস, এবং নিশ্চয়ই একবার আমার কাছে যেও, ভুলে যেও না যেন।

আচ্ছা, ভুলব না।—বলিয়া সে চলিয়া গেল।

তখন অনেক রাত হইয়া পড়িয়াছে। সেই জনবিরল রাস্তা ধরিয়া দেবব্রত একলা হাঁটিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু তখনও তাহার কানের গোড়ায় কল্যাণীর সতেজ কথাগুলি বারে বারে বাজিয়া উঠিতেছিল। তাহার উজ্জ্বল মুখচ্ছবি সহসা আবার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। এমন সে অন্য কোথাও দেখিয়াছে বলিয়া তো তাহার মনে পড়িল না।

কিন্তু সত্য-মিথ্যার জয়-পরাজয় লইয়া তাহার নিজের মনে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। তবে যে গভীর বিশ্বাস লইয়া কল্যাণী এই দুনিয়ার পথে চলিয়াছে, মানুষের কঠিন আঘাতে তাহা ভাঙিয়া পড়িবে না তো ? চলিতে চলিতে কেবল এই কথাই সে ভাবিতে লাগিল।

১১

অতীত দিনের সব কথা আজ আর কল্যাণীর তেমন করিয়া মনে পড়ে না। কবে তাহার আপনার জন একে একে এই পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছিল, এখন সেসব ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। কেবল মনে পড়ে, যেদিন হইতে সে অজিতের হাত ধরিয়া গ্রামের পথে ঘুরিয়া বেড়াইত; সমস্ত দিন পথে পথে, গাছের তলায়, কাটাইয়া দিয়া, সন্ধ্যার আঁধারে এক অনাত্মীয়ের কুঁড়েঘরে আশ্রয় লইত। তখন তাহার বয়স মাত্র নয় বৎসর; কিন্তু গাছপালা-ঘেরা গ্রামের নির্জ্জন স্থান-গুলিই তাহার ছিল সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ আশ্রয়। লোক-চক্ষুর বাহিরে কোন নিরালা স্থানে আসিয়াই সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিত। খরগোশ-শিশুগুলি যেমন করিয়া মানুষের ভয়ে গর্ত্তে লুকাইতে চেষ্টা করে, অনেকটা সেইভাবেই সে পলাইয়া বেড়াইত। অতি-পরিচিত লোক দেখিলেও সে যেন চমকাইয়া উঠিত। মানুষের চোখের দৃষ্টি যে এত কঠিন, তাহা সে সহসা উপলব্ধি করিতে লাগিল। কিন্তু এমন করিয়া বেশিদিন কাটিল না। পলাইয়া বেড়াইবার অবসর আর তাহার রহিল না। জল টানিয়া, কাঠ কুড়াইয়া সমস্ত দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। নদীর ঘাট হইতে জলের কলসী

সে একলা বহিয়া আনিতে পারিত না। তাই কখনও বিশ্রাম করিয়া, কখনও বা ভাই-বোনে টানাটানি করিয়া লইয়া আসিত। গ্রামের লোকে চাহিয়া দেখিত আর উপভোগ করিত।

এইভাবে এক বৎসর কাটিয়া গেল।. এই সময়ের মধ্যে কল্যাণী অনেক কিছু শিখিয়াছে, অনেক কিছু বুঝিয়াছে। এখন আর তাহার মন সহসা চঞ্চল হয় না। কিন্তু যে আশ্রয় সে অমন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করিয়া এতদিন আঁকড়াইয়া ধরিয়া ছিল, তাহাও আর তাহার রাহল না। সেই অনাত্মীয় আশ্রয়দাতা তাহাদের বোঝা আর বহিতে চাহিলেন না। তাই নিরুপায় হইয়া একদিন তাহারা এক পরিচিত লোকের সহিত গ্রাম ছাড়িয়া শহরে চলিয়া আসিল। গ্রামের তুই ক্রোশ দূরেই শহর, অনেক লোকজনের বসবাস, যদি সেইখানে কোন সুবিধা হয়—এই আশায়। গৃহ-পালিত পশুগুলি যেমন করিয়া শহরে বিক্রয় করিতে আনে, অনেকটা সেইভাবেই লোকটি তাহাদের লইয়া বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে এক স্থানে আশ্রয় মিলিয়া গেল। কল্যাণী যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

প্রকাণ্ড বাড়ি, গাড়ি-ঘোড়া, দাস-দাসী, লোক-জনে পরিপূর্ণ। তাহারই ভিতর ইহারা তুইজনে আশ্রয় লাভ করিল। কল্যাণী সমস্ত দিন ঘর-তুয়ার পরিষ্কার করে এবং

অবসর-সময় বধূদের প্রসাধনে সহায়তা করিতে পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়ায়। আর অজিত জুতা ব্রুশ করে এবং আদেশের অপেক্ষায় দোরগোড়ায় বসিয়া থাকে। এইভাবে আবার এক বৎসর কাটিয়া গেল। শহরের আবহাওয়া তাহাদের মনের উপরে অনেক পরিবর্ত্তন আনিয়া ফেলিয়াছে। হয়তো এমনই করিয়াই আরও কিছুকাল অতিবাহিত হইত; কিন্তু সহসা এক ঘটনা ঘটিয়া আবার সমস্ত উলট-পালট করিয়া দিল

বর্ষাকাল, অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছিল। কল্যাণী সমস্ত দিন জলে ভিজিয়া খাটিয়া খাটিয়া দেহটা ভারী করিয়া তুলিয়াছিল। অত্যধিক পরিশ্রমে মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইহার উপর এক তুচ্ছ কারণে অজিত যখন চাবুক খাইয়া পিঠের চামড়া ফুলাইয়া ফেলিল, তখন আর সে সহ্য করিতে পারিল না। এক সময় আসিয়া চুপি চুপি বলিল, চল অজিত, আমরা এখান থেকে চ'লে যাই।

অজিত ঠিক বুঝিল না, জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাবে দিদি?

চল, যেখানে হয় চ'লে যাই।

কিন্তু বড্ড বৃষ্টি পড়ছে যে!

পড়ুক, তুই চল।

পথের কাহিনী

অজিত চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে তখন অসীম দুর্য্যোগ। আকাশ ভাঙিয়া বৃষ্টির জল মুষল-ধারায় নামিয়া আসিতেছিল। বন্যার স্রোতের মতই পথ-ঘাট-মাঠ ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, নিবিড় আঁধারে চারিদিক ঢাকিয়া আছে। সম্মুখে দৃষ্টি যায় না। তবু সেই অন্ধকারে দুইজনে বাহির হইয়া আসিল। ঝ'ড়ো হাওয়া প্রতি পদে তাহাদের ঠেলিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতে লাগিল। প্রতি মেঘের ডাকে অন্তরাত্মা তাহাদের চমকাইয়া উঠিতে লাগিল। তবু তাহারা হাত-ধরাধরি করিয়া প্রাণপণে ছুটিয়া আসিল। অনেক দূর আসিয়া এক পরিচিত গৃহদ্বারে ধাক্কা দিল। এক বৃদ্ধ স্কুল-মাস্টার দরজা খুলিয়া তাহাদের ভিতরে আশ্রয় দিলেন। সেই দিন হইতে সেই গৃহে তাহাদের জীবনযাত্রা আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইল। বৃদ্ধের সরল ব্যবহারে দিন তাহাদের সহজ হইয়া আসিল। জীবনে এই প্রথম তাহারা বইয়ের পাতা খুলিয়া বসিল। বৃদ্ধ নিজে সযত্নে তাহাদের পড়াইতে লাগিলেন। ইহার পর কেমন করিয়া যেন, স্বপ্নের মতই, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল; দীর্ঘ পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গেল।

এই সময়ের মধ্যে কল্যাণী অনেক পরিশ্রম করিয়া বৃদ্ধের আলমারি-ভরা বইগুলি পড়িয়া সব শেষ করিয়াছে। নিজ

হাতে বাড়ি-ঘর পরিষ্কার করিয়া বাগান বানাইয়াছে। চারিদিকে ফুলের গাছে ভরিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু ইহার পর বৃদ্ধ অকস্মাৎ একদিন দেহত্যাগ করিলেন। কল্যাণীর চোখের সম্মুখে আবার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। তাহার দেহের কূলে কূলে তখন যৌবনের ঢেউ লাগিয়াছে। অতুল রূপ-লাবণ্যে সর্ব্বদেহ ভরিয়া গিয়াছে। এই সময় আবার তাহাকে দিশাহারা করিয়া ফেলিল।

বৃদ্ধের অযোগ্য পুত্র প্রথমেই অজিতকে গৃহ হইতে বিদায় করিয়া এক অনাথ-আশ্রমে পাঠাইয়া দিল। তারপর দৃষ্টি দিল কল্যাণীর প্রতি। কিন্তু সে দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা ছিল না। কল্যাণী মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। বারে বারে কেবল এই কথাই সে ভাবিতে লাগিল যে, এই যে চরম অশ্রদ্ধা, ইহাই কি তাহার পাওনা ছিল? এই বাড়ি-ঘর, এই বাগান সে কত পরিশ্রম করিয়াই না সাজাইয়া তুলিয়াছে! কিন্তু এইসব যে তাহার আপনার নয়, তাহার কোনই দাবি নাই—এই কথাই সে অকস্মাৎ উপলব্ধি করিল। এই কঠিন সত্য এতদিন তাহার মনে অস্পষ্ট ছিল, কিন্তু এইক্ষণে তাহা প্রকট হইয়া দেখা দিল। জীবনে এই প্রথম সে অনুভব করিল যে, এই পৃথিবীতে কোথাও তাহার দাবি নাই, আপনার বলিতে কিছুই নাই।

অনেক দিন পরে কি একটা উপলক্ষ্যে অজিত আসিয়া দেখা করিল। অবসরমত বলিল, দিদি, ঐ আশ্রমে আর আমি থাকতে পারব না।

কেন ?

না, অমন অমানুষের মত কেউ কি বাঁচতে পারে ?

তবে কি করবি ?

বিদেশে কোথাও চ'লে যাব, আর যে ক'রেই হোক নিজের পথ খুঁজে নিতে হবে।

তবে তাই কর, আমিও এই বাড়ি ছেড়ে দোব।

ছেড়ে দেবে কেন ?

অনেক কারণ আছে।

কোথায় যাবে তুমি ?

কিছু ঠিক নেই, যেখানেই হোক যেতে হবে।

অজিত ঠিক বুঝিল না। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরেই সে আশ্রম ছাড়িয়া কারখানায় চাকরি লইয়াছিল।

কল্যাণীও বৃদ্ধের গৃহ ত্যাগ করিল। কিছুকাল নানাস্থানে সেলাই শিখাইয়া, কোথাও বা মেয়ে পড়াইয়া কাটাইয়া দিল। তারপর এক বিলাত-ফেরত পরিবারে চাকরি লইল। কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়ের ভার লইয়া আবার সে জীবন-যাত্রা শুরু করিয়া দিল। কিন্তু মনিবের রুক্ষ মেজাজ ও সন্দিগ্ধ মন এবং

তদুপরি কঠিন শাসন, তাই দিন কাটিতে লাগিল সাবধানে। তবু এইখানে আবার সে সুখের স্বপ্ন দেখিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু মন তাহার মুহূর্ত্তেই নিরাশ হইয়া পড়িত।

এই সময় একদিন অজিতের অসুখের চিঠি আসিল। সে চিঠি দেখাইয়া মনিবের কাছে ছুটি চাহিল। কিন্তু তিনি ছুটি দিলেন না। ইহাদের আবার স্নেহ-মমতা আছে, ভাইয়ের অসুখে ছুটিয়া যাইবার প্রয়োজন হয়, এসব তিনি তাঁহার অসীম মনে স্থান দিলেন না। বরং এই কথাই জানাইয়া দিলেন যে, যদি সে চলিয়া যায়, তবে চাকরি আর তাহার রহিবে না। কল্যাণী নিরুপায় হইয়া অনুমতি না লইয়াই, এক পরিচিত লোকের সহিত চলিয়া আসিল।

প্রায় মাসাবধি কাল পরে অজিতকে সঙ্গে লইয়া যখন সে ফিরিয়া আসিল, সন্দেহে তখনও তাহার মন দুলিতেছিল; হয়তো এই গৃহে তাহার আবার স্থান হইবে। তাই সে দেখা করিতে চলিল। গৃহের সম্মুখে আসিয়া অজিতকে বলিল, চল অজিত, দুজনে সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।

অজিত বলিল, আমি যেতে পারব না দিদি, তুমি একলা যাও।

যেতে পারবি না কেন?

না, আমি এই গাছতলায় ব'সে থাকি, তুমি দেখা ক'রে এস।

চল না যাই, বেশি দেরি হবে না।

না, জীবনের এতগুলো দিনই যদি তুমি একলা পথে চলতে পেরেছ, আজ কি আমায় সঙ্গে যেতে হবে ?

কল্যাণী কেন যে তাহাকে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিতেছে, অজিত তাহা বুঝিল না। সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজেই দেখা করিতে চলিল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিল। এই বাড়ির গৃহদ্বার তাহার সম্মুখে চির-দিনের মতই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আর তাহার স্থান হইবে না, এই কথাই গৃহস্বামী তাহাকে সহজভাবে জানাইয়া দিলেন।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, কি দিদি, কিছু আশা পাওয়া গেল ?

কল্যাণী বলিল, না, আর তাঁরা রাখবেন না।

আমি তা আগেই জানি, এখন তা হ'লে কি করবে ?

তাই তো ভাবছি, কি করা যায় বল দেখি ?

ভেবো পরে, চল, এখন কোথাও গিয়ে বিশ্রাম করা যাক, তারপর ধীরে সুস্থে ভেবে ঠিক করা যাবে।

তবে তাই চল, কোথাও আশ্রয় নেওয়া যাক।

দুইজনে একটা রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিল। এই শহরের পথ-ঘাট, বাড়ি-ঘর, সবই তাহাদের পরিচিত। এই যে প্রতি পদে এত লাঞ্ছনা, এত নির্দ্দয়তা এতদিন তাহারা

ভোগ কবিয়া আসিয়াছে, তবু এই স্থান তাহাদের কতই না প্রিয়, কতই যেন আপনার। এই পরিচিত গাছপালা, বাগান, দালান-কোঠা, অনেকদিন পর দেখিয়া অজিত সহসা মুগ্ধ হইয়া গেল।

আশ্রয় একটা মিলিল এবং কয়েকদিন বাস করিবার পর অজিত বলিল, এইবার আমি ফিরে যাই, কি বল দিদি ?

কল্যাণী বলিল, এত শিগগিরই চ'লে যাবি ?

এখানে ব'সে থেকে তো কিছু লাভ নেই, ফিরে যাওয়াই ভাল। কিন্তু তুমি কি করবে ঠিক করেছ ?

এখনও কিছু ঠিক করি নি, কি করা যাবে বল দেখি ?

তুমি সেই পাদ্রী সাহেবের কাছেই চ'লে যাও দিদি, তাঁরা তো তোমায় কতবার অনুরোধ করেছেন।

আমিও সেই কথাই ভাবছি, তা ছাড়া তো কোন উপায়ও দেখছি না।

অজিত বলিল, উপায় আর কিছু নেই। তুমি সেইখানেই যাও দিদি, তাতে তোমার ভালই হবে।

কল্যাণী উত্তর দিল না, চুপ করিয়া কি যেন নিজের মনে ভাবিতে লাগিল।

অজিত ফিরিয়া আসিল। আবার সে মহানগরীর পথ ধরিয়া চলিতে থাকে। কিন্তু তাহার দেহ ও মন অতিশয় ক্লান্ত

হইয়া পড়িয়াছে। কি জানি কেন তাহার অন্তরাত্মা সহসা ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। পথের দুই ধারে যাহা তাহার চোখে পড়ে, মনে হয়, সবই যেন নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয়। যেন সমস্ত দুয়ার তাহার কাছে রুদ্ধ হইয়া আছে। তাহার দুই চক্ষু সজল হইয়া আসে। মন তাহার অভিমানে ভরিয়া উঠে, কিন্তু তাহা কাহার উপর ?

১২

বর্ষা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সিক্ত প্রকৃতি নবরূপে সাজিয়া উঠিয়াছে। এই বর্ষাকালটা দেবব্রত অজিতের অপেক্ষায় বসিয়া ছিল। হয়তো সে দেখা করিতে আসিবে, কিন্তু সে আসিল না। এতদিন তাহার মন শুধু তাহাদের পিছনে পিছনেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। কিন্তু সন্ধান করিয়া উঠিতে পারে নাই।

সেদিন ভোরবেলা কি ভাবিয়া সে নিজের বাক্স বিছানা প্রভৃতি গুছাইতে আরম্ভ করিল। জহর জিজ্ঞাসা করিল, বাবু, কোথাও কি বেড়াতে যাবে?

হ্যাঁ, বেড়াতে যাব।

কোথায়, পাহাড়ে?

না।

তবে কোথায়? আমি কিন্তু সঙ্গে যাব।

দেবব্রত বলিল, আমি দেশে যাব।

দেশে? সে তো জঙ্গল বাবু, সেখানে কি করতে যাবে?

আমার কাজ আছে।

এমন কি কাজ আছে যে, এই সুস্থ দেহটা খোয়াতে যাবে?

দেবব্রত বলিল, অনেক বছর যাই নি, তাই ভাবছি একবার ঘুরে আসব।

কিন্তু বাবু অসুখ হ'লে কে দেখবে?

অসুখ হবে না। আমার বইগুলো রইল, তুমি দেখো, যেন নষ্ট না হয়।

জহর চুপ করিয়া গেল। মনিবের কেন যে এমন মতিভ্রম হইল, সেই কথাই সে ভাবিতে লাগিল। তাহার দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না।

প্রায় এক যুগ পরে, এক অজানা অতিথির মতই সে যখন দেশের মাটিতে পা দিল, তখন কি জানি কেন তাহার সমস্ত উৎসাহ ফুৎকারে নিবিয়া গিয়াছে। অনভ্যস্ত পথ-ঘাট, অপরিচিত লোক-জন, জীর্ণ ঘর-দুয়ার তাহাকে নিরাশ করিয়া তুলিল। এক দূর-আত্মীয় তাহার বসত-বাড়িখানা স্বচ্ছন্দে দখল করিয়া বসিয়া আছেন। তাহারই একটা প্রকোষ্ঠে সে কোন প্রকারে স্থান করিয়া লইল। কিন্তু বাড়ি-ঘরের এ কি চেহারা! ইহাই কি মনুষ্যবাসের উপযুক্ত স্থান? দেয়ালের গায়ের চুন-সুরকি কবে যে খসিয়া গিয়াছে তাহার ঠিক নাই। স্থানে স্থানে গাছপালা গজাইয়া এক অদ্ভুত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে। বাড়ির একটা অংশ ভাঙিয়া পড়িয়া জঙ্গল হইয়া উঠিয়াছে। মন তাহার পলাইয়া আসিতে চাহিল। হয়তো

সে চলিয়া আসিত, যদি তাহার সেই আত্মীয়টি ব্যবহারে ও যত্নে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া না রাখিতেন। গাছের ফল পাড়িয়া, পুকুরের মাছ ধরিয়া, স্বামী-স্ত্রী দুইজনে সর্ব্বক্ষণ তাহারই পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিলেন। সে অবাক হইয়া গেল। অরুণের সহিত দেখা হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল, কিন্তু তাহারও সন্ধান পাইল না। কোথায় সে চলিয়া গিয়াছে কেহ বলিতে পারিল না।

সে একলা গ্রামের পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। কতই না পরিবর্ত্তন তাহার চোখে পড়ে। পরিচিত লোক ক্বচিৎ দেখিতে পায়। পূর্ব্বে এই গ্রামের সমৃদ্ধি ছিল, কিন্তু এখন আর কিছুই নাই। চারিদিকে কেবল শূন্য ভিটা ও ভাঙা বাড়ি গাছপালায় ঘিরিয়া আঁধার করিয়া রাখিয়াছে। কোথাও বা এক একটা কোঠাবাড়ি দুয়ার বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গৃহস্বামী কতকাল যে বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসেন না, তাহার ঠিকানা নাই। একদিন এই বাড়িগুলির সৌষ্ঠব ছিল, কিন্তু এখন নাই। কেবল বাগানের ফুলের গাছগুলি আজও তাহার সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। অকাতরে কত ফুলই ফুটিয়া উঠে, আবার ঝরিয়া পড়ে। পথ চলিতে সহসা মানুষ থামিয়া যায়, মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া থাকে।

ঐ যে দূরে, নদীর তীরে, ভূস্বামীর প্রাসাদ-তুল্য বিরাট

অট্টালিকা উঁচু হইয়া আছে, একদিন ইহা অনেক উজ্জ্বল ছিল। ইহার বিচিত্র কারুকার্য্য দূর হইতেও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। এই গ্রামে বাস করিবেন বলিয়া যৌবনের প্রথমে তিনি ঐ গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সম্মুখে এক বিরাট উদ্যান সযত্নে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। .তাহাতে নানা জাতীয় ফুলের গাছ ও প্রস্তরমূর্ত্তি সারি সারি সাজানো ছিল। কিন্তু আজ তিনি বিদেশী, ক্বচিৎ কালে-ভদ্রে অতিথির মতই গ্রামে আসিয়া পদার্পণ করেন। আজ সেই অট্টালিকার সৌন্দর্য্য নাই, কারুকার্য্য নাই। সেই মনোহর উদ্যানও জঙ্গলময়। অমন যে অর্দ্ধনগ্ন-মর্ম্মর-উর্ব্বশীমূর্ত্তিগুলি, তাহাও কালি হইয়া গিয়াছে। কেবল তাহার এক সর্ব্বশক্তিমান ম্যানেজার বিদ্যমান আছেন, যাঁহার অসীম প্রতাপে গ্রামবাসীর হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। দেবব্রত একদিন তাঁহাকে দূর হইতে দেখিতে পাইল। তিনি ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া, বন্দুক ঘাড়ে করিয়া বাহির হইয়াছেন। সে দূরে হইতেই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে শুভেচ্ছা জানাইল।

দেবব্রত ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই ধ্বংসস্তূপগুলি দেখিতে থাকে, আর অলক্ষ্যে তাহার অন্তস্তল হইতে দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসে। একদিন একটি অল্পবয়স্ক ছেলে নিজে সাধিয়া তাহার সহিত আলাপ করিল। ছেলেটি শহরের কলেজে

পড়ে। নিকটেই শহর, সে প্রতিদিন দুই চাকার গাড়ি করিয়া সেইখানে যাওয়া-আসা করে।

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি এ গ্রামে নতুন এসেছেন ?

না, নতুন আসি নি।

তবে এখানে তো পূর্ব্বে আপনাকে দেখি নি।

তুমি দেখ নি, তাই আমিও আসি নি—এমন তো হয় না।

না, তা হয় না ; তবে মনে হয়, অনেকদিন পরে এসেছেন।

আমারও তো তাই মনে হয়।

আচ্ছা চলুন, আপনাকে গ্রামটা দেখিয়ে আনি।

ছেলেটি তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়। কোন্ কবি গ্রামের পথে চলিতে চলিতে উচ্ছ্বাসে কি কথা লিখিয়া গিয়াছেন, সেইসব মুখস্থ বলিতে থাকে। গাছের ডালে, পাখির গানে, চারিদিক মুখর হইয়া আছে। কোন্ লেখক এমনই বিহঙ্গকলরবে বিভোর হইয়া কি কবিতা লিখিয়াছিলেন, সে তাহা আবৃত্তি করে। বর্ষা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তখনও নদী-খাল-বিল জলে পরিপূর্ণ। জলের উপর অসংখ্য ফুল ফুটিয়া আছে ; ঢেউয়ের সঙ্গে দিবানিশি দুলিতে থাকে। কোন্ ভাবুক আবেশে এইসবের কি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সে তাহা সুর করিয়া বলিতে থাকে। কখনও বা নৌকা করিয়া

নিজে দাঁড় টানিয়া অনেক দূর বেড়াইয়া আনে। দেবব্রতর অলস দিনগুলি মন্দ কাটে না।

কিন্তু এক সপ্তাহ অতীত না হইতেই প্রাণ তাহার ক্লান্ত হইয়া উঠিল। ঐ পাখির গানে, এই ঢেউয়ের সঙ্গে দোল-খাওয়া ফুলে আর মাধুর্য্য নাই, কিন্তু এমন সময় হঠাৎ একদিন অরুণ আসিয়া দেখা দিল।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, গ্রাম ছেড়ে কোথায় গিয়েছিলে অরুণ? আমি তোমার অপেক্ষায় ব'সে আছি।

গিয়েছিলাম আশপাশের গ্রামের ভেতর। কিন্তু তুমি এখানে কি করতে এসেছ?

এমনই। দেশে কি আসতে নেই?

আসতে নেই এমন কথাই বা কি ক'রে বলি! তবে তোমাকে এ গ্রামে আর কখনও দেখব, তা আশা করি নি। তাই আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে, সুখীও হলাম খুব।

আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। তবে আমি এখানে অচেনা হয়ে গেছি, বিদেশীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছি।

অরুণ বলিল, সে দোষ তো গ্রামের নয়। যাক, চল আমার সঙ্গে, আমার বাড়ি যাবে।

দেবব্রত বলিল, চল, কিন্তু একটা খবর আছে, যা শুনলে তুমি সুখী হবে।

পথের কাহিনী

কি খবর ?

তুমি পরীক্ষায় পাস ক'রে গেছ, তোমার এত পরিশ্রম ব্যর্থ হয় নি।

খবরটা আমি আগেই পেয়েছি। তবে পরিশ্রম খুব বেশি করেছিলাম এমন অপবাদ আমায় দিও না।

আচ্ছা, নাই বা দিলাম। কিন্তু তোমার দিনগুলি যে নষ্ট হয় নি, সেজন্য খুশি হয়েছি খুব।

দুইজনে একটা সরু রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিল। দেবব্রত বলিল, গ্রামের কতই না পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে! চারিদিকে এত লোকজন ছিল, তারা যে সব কোথায় গেছে, তাই বা কে জানে!

অরুণ ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিল, তোমারই মত অনেকে বিদেশী হয়ে গেছে। কেউ বা পরপারে যাত্রা করেছে। এই সভ্যতার দিনে গ্রামে কি কেউ বাস করতে পারে ?

এত লোক বিদেশে চ'লে গেছে ? আশ্চর্য্য !

আশ্চর্য্য হবার কি আছে ? অনেকের না গিয়ে তো উপায়ও ছিল না।

উপায় ছিল না কেন ?

কেন, তা যারা গেছে, তাদের জিজ্ঞেস করলেই ভাল বুঝতে পারবে।

দেবব্রত এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বিদেশে গিয়ে তাদের অবস্থা ভালই হয়েছে, কি বল ?

অরুণ বলিল, ভাল হয়েছে, কি মন্দ হয়েছে, ঠিক বলতে পারব না। তবে যারা গেছে, তাদের অধিকাংশই এখনও প'ড়ে আছে কারখানার বস্তিতে। সে যে কেমন স্থান, তা তো তোমার অজানা নেই।

দেবব্রত অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, দেশের বাড়িঘর ছেড়ে তারা গেছে সব কারখানায় কাজ করতে ?

অরুণ বলিল, তা ছাড়া আর কি করবে বল ? এই যন্ত্র-যুগে বেঁচে থাকবার আর কি উপায় আছে ? কল-কারখানার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা তাদের জীবনধারণের অবলম্বনগুলি, স্বাধীন বৃত্তিগুলি একে একে গ্রাস ক'রে ফেলেছে। নদীর পাড় ভাঙার মতই ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়েছে। তাই ফিরে সেই কারখানার সুমুখেই হাতজোড় ক'রে দাঁড়াবে না তো করবে কি ?

দেবব্রত চুপ করিয়া রহিল। অরুণ পুনরায় বলিতে লাগিল, একদিন এদের বাড়িঘর সবই ছিল, কিন্তু এখন আর নেই, সেদিন হয়তো সচ্ছলতা ছিল না, কিন্তু তেমনই দারিদ্র্য আজও রয়েছে। কিন্তু আজ না আছে স্বাধীনতা, না আছে তাদের জীবনের স্থায়িত্ব। ক্রীতদাসের মতই দুর্ব্বিষহ জীবনের ভার

ব'য়ে চলেছে, কখন যে অনাহারেই ভেঙে পড়বে, তাই বা কে বলতে পারে !

দেবব্রত এতক্ষণ চুপ করিয়াই শুনিতেছিল, এইবার কহিল, তুমি যাই বল অরুণ, এই সব কলকারখানার কিন্তু প্রয়োজন আছে অনেক। যদি এ গুলো গ'ড়ে না ওঠে, তবে দেশের উন্নতি কি ক'রে হবে ?

অরুণ বলিল, প্রয়োজন যে আছে, আমি তা জানি। কিন্তু সেগুলোর মূলনীতির পরিবর্ত্তন করতে হবে। লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যাতে বৃদ্ধি পায়, সর্ব্বহারার দল যেন সৃষ্টি করতে না পারে।—বলিয়া সে চুপ করিল।

কিছুদূর হাঁটিয়া আসিয়া একটা পুরানো বাড়ির দিকে চাহিয়া অরুণ বলিল, এই বাড়ির কথা তোমার মনে আছে ?

দেবব্রত বলিল, মনে থাকবে না কেন ? সেদিনও তো তোমার খোঁজ করতে এসেছিলাম।

তবে চল, ভেতরে যাই।—বলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। চারিদিকে বাগান-ঘেরা একটা ছোট দোতলা বাড়ি, অবহেলা ও অযত্নে মলিন হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই অরুণের বসত-বাড়ি।

দুইজনে দোতলার একটা ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই ঘরের সহিত দেবব্রতর পরিচয় আছে। ছোটবেলা সে

সর্ব্বদা আসা-যাওয়া করিত। কিন্তু এখনও ইহার তেমন পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেই টেবিল, সেই চেয়ার, সেই আলমারি, তক্তাপোশ এখনও তেমনই আছে। জানালা-পথে নদীর দুরন্ত ঢেউগুলি তেমনই চোখে পড়ে। বিগত দিনের বিস্মৃত মুহূর্ত্তগুলি সহসা আবার তাহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। কেবল দেওয়ালের গায়ে কয়েকখানা ছবি টাঙানো আছে, যাহা নূতন, পূর্ব্বে ছিল না। একখানা অরুণের তৈলচিত্র—উজ্জ্বল সৈনিকের বেশে বন্দুক হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আর কয়খানা সৈন্যদের যুদ্ধযাত্রার দৃশ্য—কোথাও নগর গ্রাম ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, কোথাও বা মৃতদেহ স্তূপাকারে পড়িয়া আছে, এই-সব। ইহা ছাড়া আলমারিতে কতকগুলি মূল্যবান জিনিস সাজানো রহিয়াছে, যাহা পূর্ব্বে ছিল না। লোকে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাহাকে ঐগুলি উপহার দিয়াছিল। অরুণ আলমারি খুলিয়া একে একে সেইসব দেখাইতে লাগিল। কোন্ বিশিষ্ট ব্যক্তি, কোন্ সমিতি কি জিনিস তাহাকে দিয়াছিল, তাহা বলিতে লাগিল। অতি সামান্য জিনিসও সে যত্নের সহিত রাখিয়া দিয়াছে।

অরুণের বিধবা ভগ্নী ঘরে ঢুকিয়া কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, কতকগুলি খাবার জিনিস রাখিয়া চলিয়া গেলেন।

অরুণ বলিল, এস, এইগুলোর সদ্‌ব্যবহার করা যাক।

আহারে বসিয়া দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, এতদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে কি করছিলে, সেসব তো কিছু বললে না ?

অরুণ কহিল, বিশেষ কিছু করেছি ব'লে তো মনে হচ্ছে না। শুধু ঘুরে বেড়ানোই সার হয়েছে।

তবু শুনি।

কুলিপাড়ায় যা করতে দেখেছ সেইসব, নতুন কিছু নয়।

তবে লোকের উপকারই করেছ, দিনগুলো ব্যর্থ যায় নি।

ব্যর্থ যে যায় নি, এমন কথা নিশ্চিত বলতে পারব না।

কেন, অপরের ভালই তো করেছ ?

অরুণ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, লোকের চরম দুর্দ্দিনে করবার কিছুই থাকে না। নীরব সাক্ষীর মত দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, না হয় তো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফিরে আসতে হয়।

দেবব্রত বলিল, তবে যাও কেন ?

কেন যাই, সে কথা আলাদা। না গেলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না, কিছু ঠেকে থাকে না।

তবু এসবের প্রয়োজন আছে, মূল্যও আছে অনেক।

কি যে মূল্য আছে, তাও বুঝি না। বরং অশ্রদ্ধা ও অবহেলাই পেয়েছি বেশি। তার চাইতে যদি—

তার চাইতে কি ?

যদি সৈনিকের বেশে সঙ্গিন তুলে তালে তালে পা ফেলে চলতে পারতাম, তবে বোধ হয় লোকের মনে শিহরণ জাগত, হয়তো কিছু বাহবাও পাওয়া যেত।—বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

দেবব্রত কহিল, না, তা নয়। যা ভাল্, যা মহৎ, লোকে সেইগুলোই শ্রদ্ধা করে।

অরুণ এ কথার জবাব দিল না। আহার শেষ করিয়া উঠিয়া বলিল, চল, নদীর ধারে বেড়াতে যাওয়া যাক।

সন্ধ্যা প্রায় ঘনাইয়া আসিয়াছিল। নদীর পাড়ের একটা পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে অরুণ কহিল, কি বলছিলে তুমি? যা ভাল, যা মহৎ, লোকে সেইগুলোই শ্রদ্ধা করে? কিন্তু ওসবের ধারণা তো সকলের সমান নয়। তোমার কাছে যা ভাল, অপরের চোখে তা নাও হতে পারে; বিশেষ দাম্ভিক লোকের কাছে, যারা ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ ধারণাগুলি সুবিধামত উপেক্ষা করতেই চেষ্টা করে, প্রয়োজনমত ঝেড়ে ফেলতেই চায়।

দেবব্রত কহিল, এতবড় সমাজের মন্দ দিকটাই তোমার চোখে পড়েছে বেশি। ভাল্ একটা দিকও তো আছে।

অরুণ জবাব দিল, আছে, কিন্তু তা যেন কাঙালের মত নত হয়ে পথের পাশে দাঁড়িয়ে মিনতি ক'রে নীতিকথা

শোনাতে থাকে, আর বুক ফুলিয়ে যারা চলে, তারা করে উপহাস।

দেবব্রত বিশ্বাস করিল না, কহিল, না, মানুষের এত শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতার কোন মূল্যই তা হ'লে থাকে না অরুণ।

অরুণ উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটিয়া শেষে কহিল, আমিও সেই কথাই ভাবি যে, এসব কেমন ক'রে সম্ভব হয়। অফুরন্ত আহার্য্যের মাঝখানেই লোকে অনাহারে দেহত্যাগ করে, এ কেমনধারা সভ্যতা? কারখানার মালিকদের ঐশ্বর্য্যের বহর তোমার অজানা নেই, এবং তারই পাশে কুলি-মজুরদের দুর্ব্বিবহ জীবন-যাত্রাও তুমি স্বচক্ষে দেখে এসেছ। এসব কেমন ব্যবস্থা?

নদীর পাড় ছাড়িয়া গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া অরুণ পুনরায় বলিতে লাগিল, আজ যারা পায়ের নীচে পিষে আছে, চিরদিনই তারা অমনই থাকবে না। মনে ভেবো না, তাদের এই দুর্দ্দশার নিমিত্ত দায়ী আমরা মোটেই নই। আজ যদি তাদের পাশে না দাঁড়াই, কে জানে, একদিন হয়তো অনেক মূল্য দিয়েই ফিরে আসতে হবে। তারপর হঠাৎ থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যাবে আমার সঙ্গে?

দেবব্রত বলিল, কোথায় যাব?

আশপাশের গ্রামের ভেতর, যেখানে আমি এতদিন ঘুরে বেড়িয়েছি।

কি হবে সেখানে গিয়ে ?

দেখতে পেতে, কেমন ক'রে সভ্যতার মুখোশ সেখানে খ'সে প'ড়ে গেছে।

দেবব্রত ঠিক বুঝিল না, বলিল, কবে যেতে হবে ?

কাল ভোরবেলা তোমায় নিয়ে যাব, তুমি ঠিক হয়ে থেকো।

আচ্ছা, নিয়ে যেও।

অরুণ সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া আসিয়া তাহাকে বাড়ি অবধি পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া গেল।

১৩

পরদিন প্রত্যুষে দুইজনে কাঁধে ব্যাগ ঝুলাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। কবে ফিরিয়া আসিবে তাহার স্থিরতা নাই, তাই কিছু আবশ্যকীয় জিনিস সঙ্গে লইয়া রওনা হইল। ভোরের আলো তখন গ্রামের পথে সবে উঁকি মারিতে শুরু করিয়াছে। গাছের ডালে পাখির গানে চারিদিক মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

অনেক বেলা অবধি গ্রামের পর গ্রাম তাহারা পার হইয়া গেল। কিন্তু তারপর যতই তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল, এক ভয়াবহ দৃশ্য তাহাদের চোখে পড়িতে লাগিল। চারিদিক যেন শ্মশানের মতই খাঁ খাঁ করিতেছিল। দেবব্রত মনে মনে কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল।

পথে লোক-চলাচল নাই। কোথাও একটু সাড়া নাই, শব্দ নাই, চারিদিক গভীর নিস্তব্ধ। বাড়িঘর সব পরিত্যক্ত ও আবর্জ্জনাময়। দুয়ার উন্মুক্ত, সব ফেলিয়া সকলে কোথায় যেন পলাইয়া গিয়াছে। গাছের ডালে পাতা নাই, একটি ফল নাই। কোথাও একটা পাখি নাই, একটু কলরব নাই। দারুণ দুর্য্যোগে সবই যেন বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। এমন নিস্তব্ধ গ্রামের পথে চলিতে প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

কিছুদূর হাঁটিয়া আসিয়া তাহারা মাঠের মধ্যে একদল

লোকের দেখা পাইল। তাহাদের অর্দ্ধনগ্ন কঙ্কালসার মূর্ত্তি দেখিয়া দেবব্রত শিহরিয়া উঠিল। মনে হইল, লোকগুলি বুঝি ক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। অপরিচিত মানুষ দেখিলে তাহারা ছুটিয়া আসিয়া চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ধরে, সব ছিনাইয়া লইতে চায়। অরুণকে দেখিয়া তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিল, ঘিরিয়া ধরিয়া বলিল, বাবু, পয়সা দাও, খেতে দাও। অরুণ পকেট হইতে কতকগুলি পয়সা বাহির করিয়া তাহাদের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া নিস্তার পাইল। আবার তাহারা চলিতে আরম্ভ করিল। আবার একদল লোক তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই অর্দ্ধনগ্ন বুভুক্ষু মূর্ত্তি, চক্ষু কোটরগত, অস্থিচর্ম্মসার দেহ। মনুষ্য-জীবনের সবই তাহারা হারাইয়া ফেলিয়াছে। অতি আপনার জনও যেন এখন আর তাহারা চিনিতে পারে না। এমন করিয়া দলের পর দল লোক তাহাদের সম্মুখে আসিয়া চলিয়া গেল।

দেবব্রতর কণ্ঠ শুকাইয়া উঠিয়াছিল। একটা গাছতলায় আসিয়া সে বলিল, এস অরুণ, এইখানে বিশ্রাম করি।—বলিয়া হাত পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িল। অরুণ অগত্যা তাহার কাছে আসিয়া বসিল।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, এমন অবস্থা কি করে হ'ল বলতে পার?

অরুণ কহিল, কি ক'রে হ'ল, তার সব খবর আমারও জানা নেই। তবে অনেকদিন থেকেই এ অঞ্চলে অনটন চলছিল। একদল লোক প্রায় অনাহারেই দিন কাটাচ্ছিল। কেউ কেউ বা গাছের পাতা খেয়ে, অখাদ্য ফল খেয়ে, উইমাটি খেয়ে জীবন-ধারণ করছিল। ফলে দেখা দিল মহামারী ব্যাধি। গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস হতে লাগল। যারা অবস্থাপন্ন, তাদের অনেকেই প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল শহরে। যারা প'ড়ে রইল, তাদের কতক পরপারে যাত্রা করেছে। কেউ কেউ এখনও কোনমতে টিকে আছে। আর বাকি লোকগুলোর অবস্থা তো তুমি স্বচক্ষেই দেখতে পেলে।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, অন্য জায়গা থেকে কি কোনই সাহায্য আসে নি?

অরুণ বলিল, এসেছিল, কিন্তু তা অতি সামান্য। শহর থেকেও একদল ছেলে এসে অনেকদিন কাজ করছে, এবং তাদের তহবিলও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

দূরে একটা প'ড়ো বাড়ির ভিতর সেই ছেলের দল বাস করিতেছিল। দুইজনে আসিয়া তাহারই একটা ঘরে আশ্রয় লইল এবং তাহাদের সহিত এই দুঃস্থ লোকদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিল। সময়ে অসময়ে রোগীর শিয়রে বসিয়া, আর অনাহারী লোকের আহার্য্য যোগাইয়া দিন কাটাইতে

লাগিল। কাঁধে করিয়া কত মানুষকেই যে পরপারে পৌঁছাইয়া দিল, তাহার সীমা নাই। কেমন করিয়া যে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, দেবব্রত তাহা অনুভব করিতে পারিল না। কেমন একটা নেশার ঘোরে সে যেন মাতিয়া উঠিয়াছিল। মুখে তাহার ভাষা নাই, কথা বলিবার প্রবৃত্তিও নাই। দূরে, নদীর তীরে, একটি বর্দ্ধিষ্ণু বন্দর আছে। অনেক লোকজন যাওয়া-আসা করে, অনেক কেনা-বেচা হয়। দুইজনে সেখান হইতে আহার্য্য ও আবশ্যকীয় জিনিসপত্র কিনিয়া আনে এবং লোকদের মধ্যে বিলাইয়া দেয়। সভ্য জগতের উপর দেবব্রতের ক্রমশ যেন অশ্রদ্ধা ধরিয়া আসিতেছিল।

প্রায় এক মাস কাটিয়া গেল, ব্যাধির মহামারী মূর্ত্তি অনেকটা শান্ত হইয়া আসিতে লাগিল। একদিন অরুণ বলিল, চল, এইবার ফিরে যাওয়া যাক।

দেবব্রত বলিল, এত শিগগিরই যাবে।

অরুণ কহিল, আর কি করব বল, রোগের প্রকোপ যখন ক'মে গেছে তখন আর ব'সে থেকে কি লাভ? তা ছাড়া ছেলেরাও সব চ'লে যাচ্ছে।

কিন্তু এখনও তো অনেক কাজ বাকি আছে।

যে কাজ বাকি রইল, তা সম্পন্ন করা আমাদের দুজনের দ্বারা তো সম্ভব হবে না। অনেকদিন এবং অনেক চেষ্টার

ফলে আস্তে আস্তে গ'ড়ে উঠবে। তাই চল, এখন ফিরে যাই।

দেবব্রত অগত্যা রাজি হইল। গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া সে কহিল, কাল আমি এখান থেকে চ'লে যাব অরুণ।

অরুণ বলিল, কালই যাবে?

হ্যাঁ, আর থাকতে পারব না।

আচ্ছা, অনেকদিন হয়ে গেছে, কি ক'রে আর থাকতে অনুরোধ করি।

পরদিন সে তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্টেশনে আসিয়া তাহাকে গাড়িতে উঠাইয়া দিল।

দেবব্রত কহিল, তুমিও আমার সঙ্গে চল না কেন?

না, এখন আমার যাবার উপায় নেই। এখানে অনেক কাজ আছে।

তবে তোমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে?

অরুণ বলিল, যেদিনই হোক, আবার হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে যাবে।

১৪

দেবব্রত স্বগৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। এতদিন তাহার নিজের চেহারা চাহিয়া দেখিবার অবসর হয় নাই। কিন্তু এখন সে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজেই যেন চমকাইয়া উঠিল। কপালের শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিয়াছে, তাহার বয়সও যেন হঠাৎ অনেক বৎসর বেশি হইয়া গিয়াছে এমনই মনে হইতে লাগিল।

জহর জিজ্ঞাসা করিল, বাবু, সেখানে কি তোমার কোন অসুখ করেছিল?

না।

তবে কি সময়মত খাওয়া-দাওয়া হয় নি, মাঝে মাঝে উপোস দিতে হয়েছিল?

উপোস দিতে হবে কেন?

তবে দেহটা এত রোগা হয়েছে কেন? আবার কিছুকাল না হয় পাহাড়ে বেড়িয়ে এস।

দেবব্রত উত্তর দিল না। জহর পুনরায় বলিল, বাবু, ব্যাঙ্কের এই খাতা তো প্রায় শেষ ক'রেই এসেছ, এই কটা পাতা আর বাকি রেখেছ কেন? খরচ ক'রে এলেই তো পারতে। টাকাগুলো কি জঙ্গলে ফেলে রেখে এসেছ?

দেবব্রত কথা কহিল না। জহর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল।

শুধু দেহে নয়, মনেও তাহার অনেক পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। আপন মনে কি যেন সে সর্ব্বক্ষণ ভাবিতে থাকে। লাইব্রেরির বইগুলি আর তাহাকে তেমন আকৃষ্ট করে না। বক্তৃতা শুনিবার স্পৃহাও তাহার অনেক কমিয়া গিয়াছে। সকাল সন্ধ্যা রাস্তার ভিড়ের মধ্যে সে মিশিয়া যায়, উদ্দেশ্যহীন পথে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে। এইভাবে কয়েক মাস কাটিয়া গেল।

একদিন সে জহরকে বলিল, চল জহর, কিছুকাল দেশে গিয়ে বাস করা যাক।

দেশে? আবার সেই জঙ্গলে?

না, গ্রামের কাছেই যে শহর আছে, সেইখানে। সেই শহরে তো আমাদের একটা বাড়িও আছে।

সে বাড়িতে তো অপরে বাস করে বাবু।

না, এখন আর কেউ নেই। বেশ আরামে থাকতে পারব, কোন অসুবিধে হবে না।

হঠাৎ এমন মন করলে কেন বাবু?

এমনই, তোমার যদি ইচ্ছে না হয়, তবে নিজের দেশেই না হয় যাও, কিছুকাল বেড়িয়ে এস।

জহর বলিল, নিজের দেশে আমার কে আছে যে, সেখানে যাব? তা ছাড়া তোমাকে ফেলে আমি সেখানে কি থাকতে পারব?

দেবব্রত বলিল, তবে চল, দুজনেই যাই, যদি দরকার হয় আবার ফিরে আসব।

ইহার পর কয়েক মাসের মধ্যেই সে এই ভাড়াটিয়া বাসা তুলিয়া দিয়া দেশের শহরে উঠিয়া আসিল।

আবার সে অনেক পরিশ্রম করিয়া বাড়িঘর সাজাইয়া লইল। কিন্তু শহরের এক প্রান্তে এই নির্জ্জন গৃহে বাস করিতে প্রাণ তাহার ক্লান্ত হইয়া পড়িল। স্কুল-জীবনের শেষ কয়েক বৎসর সে এই শহরে বাস করিয়াছিল, তারপর আর আসে নাই। এখন ইহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অনেক নূতন রাস্তা, বাড়িঘর চারিদিকে গড়িয়া উঠিয়াছে। চলিতে চলিতে কেবল তাহার চোখে পড়ে অপরিচিত মুখ, কেহই যেন তাহাকে চেনে না। কিন্তু সেদিন এক বন্ধুর সহিত তাহার দেখা হইয়া গেল। বন্ধু মোটর থামাইয়া সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এখানে কবে এসেছ?

এসেছি অনেকদিন।

কতদিন থাকবে?

কিছু ঠিক নেই।

শুনলাম, ইউনিভার্সিটির শেষ পরীক্ষাতেও তুমি প্রথম হয়েছ?

আমিও তো সেই কথাই শুনছি।

এখন কি করবে ঠিক করেছ?

কিছু ঠিক করি নি।

বড় একটা চাকরি যোগাড়ের চেষ্টায় নিশ্চয়ই আছ?

না, তেমন কোন চেষ্টায় নেই।

তোমাকে আমাদের ক্লাবে একদিন যেতে হবে।

কোথায় তোমাদের ক্লাব?

সেই যে মাঠের মধ্যে ছোট একটা বাড়ি, সেইটে।

কি আছে সেখানে?

অনেকরকম খেলাধূলার ব্যবস্থা আছে। তোমাকে কিন্তু মেম্বার ক'রে নেব।

আচ্ছা, তাই নিও।

কাল বিকেলে এসে তোমায় নিয়ে যাব, তুমি ঠিক হয়ে থেকো।

আচ্ছা, নিয়ে যেও।

বন্ধু মোটরে উঠিয়া চলিয়া গেল। সে ভাল চাকরি করে। দেবব্রত স্কুলে তাহার সহিত কয়েক বৎসর পড়াশুনা করিয়াছিল। পরদিন সন্ধ্যায় আবার সে আসিল এবং তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

ক্লাবে আসিয়া বন্ধু তাহাকে অনেকের সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। লাইব্রেরিতে কি কি বই আছে, তাহা দেখাইতে লাগিল। তারপর যত প্রকার খেলার ব্যবস্থা আছে, সব বুঝাইয়া দিল। ক্লাব-ঘরে তখন অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে। নানাপ্রকার খেলা পূর্ণবেগে চলিতেছিল। কিন্তু সর্ব্বোপরি বহিতেছিল আভিজাত্যের একটা মৃদু হাওয়া। সে বসিয়া বসিয়া বড় চাকরির কথা, ক্ষমতা ও কীর্ত্তির কথা অনেকক্ষণ শুনিতে লাগিল। তারপর মোটর-গাড়ির কথা, নানাপ্রকার ফ্যাশান ও পোশাক-পরিচ্ছদের কথা অনেক রাত অবধি আলোচনা করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিল। কিন্তু পরদিন হইতে কি জানি কেন সে আর ক্লাবে গেল না।

শহরের প্রান্ত দিয়া যে রাস্তাটা বরাবর নদীর দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেই রাস্তা ধরিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যায় সে অনেকদূর হাঁটিয়া আসে। দুই পাশে দিগন্তপ্রসারিত সবুজ মাঠ এবং মাঝখানে গাছপালা-ঘেরা এই নিরালা পথ আপনি তাহাকে টানিয়া লইয়া যায়। কখনও বা সে নিজে সাধিয়া নিরক্ষর কৃষকদের সহিত আলাপ করে। অনেকক্ষণ তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া ফিরিয়া আসে। শিক্ষিত লোকের কাছে সেসব কথার মূল্য হয়তো কিছুই নাই। তবু ফিরিবার পথে

নিজের মনে বারে বারে কেবল এই প্রশ্নই সে করিতে থাকে যে, এই জগতের সৎ-অসৎ ও ন্যায়-অন্যায়ের মূল সূত্রগুলি সবই তো ইহাদের জানা আছে, কিন্তু নিরক্ষর বলিয়া সেইসব মানিয়া চলিতে ইহারা কি পিছনে পড়িয়া আছে ?

১৫

সেদিনও সে নদীর পার হইতে ফিরিয়া আসিতেছিল। সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শহরের নিকটে একটা মোড়ের কাছে আসিয়া সে সহসা থামিয়া গেল। সম্মুখেই লাইট-পোস্টের পাশে একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে দেখিয়া তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

সে কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কল্যাণী, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন ?

আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

এই শহরে কতদিন এসেছ ?

অনেকদিন এসেছি।

কোথায় থাক ?

থাকি নিকটেই একটা কুঠিতে, প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে আপনাকে আসতে দেখি, তাই ভাবলাম, আজ দেখা ক'রে যাই।

এতদিন দেখা কর নি কেন ?

ভাবছিলাম, আপনি হয়তো চিনতেই পারবেন না।

দেবব্রত বলিল, চিনতেই পারব না! তোমাদের কত যে খুঁজেছি, তার ঠিক নেই। এদিকে তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?

কল্যাণী বলিল, এমনই একটু কাজে গিয়েছিলাম।

চল, তোমায় বাসা অবধি রেখে আসি।

চলুন্।

রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, এতদিন কোথায় ছিলে?

কল্যাণী বলিল, দেশেই ছিলাম অনেকদিন, তারপর এখানে এসেছি।

অজিত কি আমার সঙ্গে একবার দেখাও করতে পারে নি?

দেখা করতে গিয়েছিল, কিন্তু আপনাকে পায় নি।

এখন কোথায় আছে সে?

অজিত? সে তো এ দেশে নেই।

কোথায় গেছে?

অনেকদিন হ'ল পশ্চিমের এক পাহাড়ী-অঞ্চলে চ'লে গেছে।

সেখানে কেন গেল?

সে কথা অজিতই ভাল বলতে পারবে।

তুমি এখানে কোথায় থাক, তা তো বললে না?

এক পাদ্রী-সাহেবের কুঠিতে।

কোন্ পাদ্রী-সাহেব?

আপনি তাঁকে চিনবেন কি না জানি না। ঐ যে বাগান-দেওয়া বাড়িটা দেখা যাচ্ছে, ঐটে।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, দেশ ছেড়ে, নিজের পরিচিত লোকজন ছেড়ে অবশেষে এই আশ্রমে কেন এলে?

সে অনেক কথা, আপনি নাই বা শুনলেন।

শুনলে কি কোন ক্ষতি আছে?

কল্যাণী জবাব দিল না। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। সে নিঃশব্দে কিছুদূর হাঁটিয়া আসিয়া বলিল, এইবার আপনি ফিরে যান, আপনাকে অনেক দূর টেনে এনেছি।

দেবব্রত কহিল, কিন্তু আমার কথার তো উত্তর দিলে না?

কি হবে উত্তর দিয়ে? আপনি এসব বুঝবেন না।

দেবব্রত কহিল, বুঝব না এমনও কি হয়! যাক, তুমি এ শহরে কতদিন থাকবে?

বেশিদিন থাকব না, শিগগিরই অন্যত্র চ'লে যাব।

আবার কোথায় যাবে?

সাহেবের আর একটা কুঠি আছে, সেইখানে।

সেখানে কেন যাবে?

সাহেবের আদেশ, তাই যেতে হবে।

দেবব্রত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কাল তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে আসব।

কখন আসবেন ?

বিকেলের দিকে, তুমি দেখা করতে পারবে তো ?

পারব, আপনি আসবেন।

দেবব্রত তাহাকে গেট পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল।

১৬

শহরের শেষ প্রান্তে এক পুরাতন বাগান-বাড়ি অনেকটা স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে ; ইহাই পাদ্রী-সাহেবের কুঠির। একদিন ইহা উজ্জ্বল ছিল, কিন্তু এখন আর নাই। পাদ্রী-সাহেব নিজেও অতিশয় প্রাচীন হইয়াছেন। যৌবনের প্রথমে তিনি ধর্ম্ম-প্রচার করিতেন। কিন্তু তারপর সেসব ছাড়িয়া দিয়া লোকসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। নিজের বসতবাড়িতে কতকগুলি নিরাশ্রয় লোককে আশ্রয় দিয়া জীবিকা উপার্জ্জনের পথ করিয়া দিলেন। লোকচক্ষুর আড়ালেই সাধারণত এই-সব কাজ সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাঁহার এই কুঠিও শহর হইতে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন হইয়াই আছে—কে ইহাতে বাস করে, কে আসে যায়, লোকে তেমন অনুভব করে না। নানাবিধ শিল্পকাজ করিয়া একদল লোক জীবিকা উপার্জ্জন করে। কল্যাণীও তাহাদের সহিত সমস্ত দিন সেলাই করিয়া উদরান্নের সংস্থান করে।

সেই বিলাত-ফেরতের বাড়ি হইতে চাকরি হারাইয়া যেদিন সে চলিয়া আসিল, সেদিনও তাহার মনে আশা ছিল যে, আবার তাহার আশ্রয় মিলিবে, আবার একটা অবলম্বন সে খুঁজিয়া পাইবে। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই মন তাহার

নিরাশায় ভরিয়া উঠিতেছিল। তাহার চোখের সম্মুখে অন্ধকার ক্রমশ যেন গাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। সমস্ত দিন ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া সন্ধ্যার আঁধারে সে ফিরিয়া আসিত, এবং পরিচিত গৃহের কোণে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিত। দিন কাটিত কখনও অর্দ্ধাশনে, কখন বা অনশনে। মাসের পর মাস এই-ভাবে কাটিবার পর একদিন সে অসুস্থ দেহ লইয়া ফিরিয়া আসিল। তারপর আর তাহার উঠিবার শক্তি রহিল না। কঠিন টাইফয়েড রোগে ক্রমশ সে অচেতন হইয়া পড়িল। হয়তো তাহার জীবন-প্রদীপ সেইবারই নিবিয়া যাইত, যদি না এই পাদ্রী-সাহেব অক্লান্ত চেষ্টা করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিতেন। আবার সে বাঁচিয়া উঠিল, এবং সেই সময় হইতেই এই পাদ্রী-সাহেবের গৃহে তাহার আশ্রয় মিলিল।

কিন্তু অসুখ হইতে উঠিবার পর তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আর তাহার আশা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই। মনুষ্য-সমাজের প্রতি তাহার আস্থা নাই, মানুষের উপরেও তাহার বিশ্বাস নাই। দেহটাও তাহার ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ভবিষ্যতের দিনগুলি কেমন করিয়া কাটাইবে, তাহা সে ভাবে না। বোঝার মতই নিজের জীবন সে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। কখন যে ইহার পরিসমাপ্তি হইবে, তাহাই বা কে বলিবে!

পরদিন বেলাশেষে দেবব্রত আসিয়া উপস্থিত হইল।

কল্যাণী গেটের কাছে অপেক্ষা করিতেছিল, বলিল, এত দেরি করলেন কেন? ভাবছিলাম, আজ আপনি আসবেন না।

দেবব্রত বলিল, বড্ড দেরি হয়ে গেছে, তুমি কতক্ষণ অপেক্ষা করছ?

কল্যাণী বলিল, অনেকক্ষণ, একটা কাজ করবার ছিল। কিন্তু তা আর হয়ে উঠবে না।

কি কাজ ছিল?

ভাবছিলাম, সাহেবের এই কুঠিতে যেসব দেখবার জিনিস আছে, আপনাকে দেখাব। অনুমতিও নিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু তার আর সময় হবে না।

দেবব্রত বলিল, খুব সময় হবে, এখনও তো অনেক বেলা আছে।

কল্যাণী বলিল, বেশি বেলা নেই। আচ্ছা, চলুন ভেতরে যাই।—বলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে তো?

কল্যাণী বলিল, না, তিনি তো এখানে থাকেন না।

তবে তিনি কোথায় থাকেন?

তিনি নানা স্থানে ঘুরে বেড়ান। তাঁর আর একটা কুঠি আছে, সেইখানেই বেশির ভাগ সময় কাটান। এখানে বড় আসেন না।

এখানে তা হ'লে কে দেখাশোনা করে?

কল্যাণী বলিল, এখানে একজন ম্যানেজার আছেন, তিনিই সব দেখেন।

বাগানের ভিতর কিছুদূর অগ্রসর হইলে, প্রাচীরের বাহিরে একটা মাঝারি-গোছের কুঠি চোখে পড়ে, কল্যাণী সেই দিকে দৃষ্টি দিয়া বলিল, এই কুঠিতেই সাহেব আগে থাকতেন। এখন এটা একরকম খালি প'ড়েই থাকে। এইটে আপনাকে দেখাব ভাবছিলাম।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, এখানে কি আছে দেখবার?

কল্যাণী বলিল, অনেক ভাল ভাল জিনিস আছে, চলুন দেখবেন।—বলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, তারপর প্রত্যেকটি ঘর ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইতে লাগিল। একটি ঘরে উল-পশম, মাটি-পাথর প্রভৃতির বহুপ্রকার শিল্প-দ্রব্য সাজানো ছিল, কল্যাণী সেইগুলি বিশেষ করিয়া দেখাইতে লাগিল। বলিল, সাহেব এইগুলো নানা স্থান থেকে সংগ্রহ ক'রে রেখেছেন। যেখানে যা ভাল দেখেছেন, নিয়ে এসেছেন। জিনিসগুলো কেমন? ভাল না?

দেবব্রত বলিল, খুব ভাল, এমন জিনিস সচরাচর চোখে পড়ে না।

তারপর আর একটি ঘরে লইয়া আসিল। সেই ঘরে

কতকগুলি ছবি টাঙানো ছিল। কল্যাণী বলিল, এই ছবিগুলো সাহেবের নিজের হাতের আঁকা। এক সময়ে ছবি-আঁকা তাঁর অবসর-সময়ের খেয়াল ছিল। কিন্তু এখন আর আঁকেন না। ছবিগুলো কেমন? আপনার পছন্দ হয় না?

দেবব্রত বলিল, খুব পছন্দ হয়।

পাশের একটা ঘরে অনেক পুরনো বই, পুঁথি প্রভৃতি বোঝাই ছিল, কল্যাণী সেই ঘরে আসিয়া বলিল, এই রকম কত বই যে আছে, তার ঠিক নেই; কিন্তু অযত্নে সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

দেবব্রত বইগুলি কিছুক্ষণ দেখিল, তারপর বলিল, আর কি দেখবার আছে?

কল্যাণী বলিল, আর বিশেষ কিছু নেই। চলুন, বাইরে যাই।

আচ্ছা, চল।

বাহিরে আসিয়া কল্যাণী বলিল, সাহেবের এই কুঠি দেখতে মাঝে মাঝে অনেক লোক আসে। ভাবলাম, আর কিছু না হোক, বইগুলোর খোঁজ পেলে আপনি হয়তো খুশি হবেন। তাই আপনাকে নিয়ে এলাম। আপনার এসব ভাল লাগে নি?

খুব ভাল লেগেছে।

এই সমস্ত বাড়িটা যে কতখানি স্থান জুড়িয়া আছে, বাহির হইতে তাহা সহজে অনুমান হয় না। প্রাচীর দিয়া ইহাকে বহু অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে। কোন অংশে লোকজন বাস করে, কোন অংশে বা শিল্পকাজ হয়। কল্যাণী আঙুল দিয়া সেইসব দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিল। তারপর তাহাকে সঙ্গে করিয়া গেটের বাহিরে আসিল।

কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিতে লাগিল, সাহেবের ঐ বইগুলো আমি অবসর-সময়ে পড়বার চেষ্টা করি, কিন্তু বুঝতে পারি না। আপনি যদি পড়তেন, তবে সব বুঝতেন।

দেবব্রত উত্তর দিল না।

চলিতে চলিতে কথা হইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে সে জিজ্ঞাসা করিল, এখানে কত লোক কাজ করে?

কল্যাণী বলিল, অনেক লোক।

তারা কি সকলেই এই কুঠিতে বাস করে?

কল্যাণী বলিল, না, কেউ কেউ বাইরেও বাস করে। সাহেব যে কত লোকের বেঁচে থাকবার উপায় ক'রে দিয়েছেন, তার ঠিক নেই।—বলিয়া উদ্দেশে তাঁহাকে নমস্কার করিল। তারপর কিছুকাল নিঃশব্দে থাকিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, এই রাস্তা দিয়ে আপনি প্রতিদিন কোথায় যান?

দেবব্রত বলিল, এমনই বেড়াতে যাই।

শুধু ঘুরে না বেড়িয়ে কোন কাজ নিয়ে থাকলেই তো পারেন।

দেবব্রত বলিল, আমিও তাই ভাবছি, কোন কাজ নিয়েই থাকব। তারপর একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করব ভাবছি।

কি ?

এই কুঠিতে থাকতে তোমার একটুও ভাল লাগে ?

ভাল লাগবে না কেন ?

আমার কিন্তু মনে হয়, তোমার একটুও ভাল লাগে না।

আমি আপনাকে বলেছি নাকি যে, আমার ভাল লাগে না ?

না, বল নি, তবে আমার তাই মনে হয়।

কল্যাণী চুপ করিয়া রহিল। দেবব্রত পুনরায় বলিল, চল, তোমাকে তোমার দেশেই কোথাও রেখে আসি।

কল্যাণী ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দেশে কোথায় রেখে আসবেন ?

যেখানেই হোক, একটা স্থান কি আর ক'রে নিতে পারব না !

কল্যাণী এ কথার উত্তর দিল না। হঠাৎ থামিয়া গিয়া বলিল, আর যাব না, চলুন, ফিরে যাই।

দেবব্রত বলিল, আচ্ছা চল, কিন্তু আমার কথার তো উত্তর দিলে না ?

কল্যাণী অস্ফুটস্বরে বলিল, কি হবে এসব কথার উত্তর দিয়ে ? তারপর কিছুদূর নিঃশব্দে হাঁটিয়া আসিয়া অনুরোধ করিয়া বলিল, কাল একবার আসবেন।

দেবব্রত বলিল, কখন আসব ?

এই বিকালের দিকেই। নিশ্চয়ই আসবেন, ভুলে যাবেন না ?

না, ভুলব না।

তারপর গেটের কাছে আসিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া কল্যাণী ভিতরে চলিয়া গেল।

১৭

পরদিন বিকালের দিকে দেবব্রত আবার আসিয়া দেখা দিল। কল্যাণী সেদিনও গেটের কাছেই অপেক্ষা করিতেছিল, বলিল, আজ খুব বেলা থাকতে এসেছেন, চলুন, আপনার সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসি।

দেবব্রত বলিল, চল, কোন্ দিকে যাবে?

চলুন, আপনার বাসার দিকেই যাওয়া যাক, কিন্তু এই রাস্তাটা ঘুরে যাই।

এতদূর ঘুরবে কেন?

এমনই কিছু বেড়ানোও হবে, শহরটাও দেখা হবে।

এই শহর কি এখনও তোমার অদেখা আছে?

না, তবে আবার না হয় দেখা যাবে।

দেবব্রত আপত্তি করিল না। দুইজনে নিঃশব্দে হাঁটিয়া চলিল। কিছুদূর আসিয়া দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, অজিতকে একবার ফিরে আসতে অনুরোধ করতে পার?

কল্যাণী বলিল, সে আর আসবে কি না সন্দেহ।

আসবে না কেন?

সেই অর্দ্ধ-সভ্য লোকদের মধ্যে বাস ক'রে সে ভালই আছে—এ কথাই লিখেছে।

তবু কি একবার অনুরোধ করতে পার না ?

কল্যাণী কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ফিরে এসেই বা কি করবে বলুন, দেশে আমাদের কি আছে ?

দেবব্রত বলিল, তবু নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশেই কি থাকতে হবে ?

কল্যাণী বলিল, নিঃস্ব যারা, তাদের দেশে আর বিদেশে কি প্রভেদ আছে ? নিজের দেশেও তো তারা বিদেশীর মতই বাস করে।

বিদেশীর মত কেন ?

তবে কি ? দেশের বুকে তাদের কি আছে ? তাদের জীবনেরই কি কোন মূল্য আছে ?

আছে বই কি।

ধর্ম্ম-যাজকদের কথাগুলো অবশ্য বলবেন না। বাস্তবের দিকে একবার চেয়ে দেখুন, এই যে নিজের বলতে কিছুই নেই, এমন জীবনের কি সার্থকতা আছে, কি মূল্য আছে ? দেশের কাছে পেয়েছি শুধু চিরলাঞ্ছনা, তাই নয় কি ?

দেবব্রত সহসা জবাব দিতে পারিল না, কল্যাণী পুনরায় কহিল, পথে পথে ঘুরে বেড়াই, আর অবাক হয়ে চেয়ে দেখি। কেবলই ভাবি, এই তো আমার দেশ, কিন্তু এ দেশে তো আমার কিছুই নেই। মনে মনে প্রশ্ন করি, কেন নেই ? সমাজ শুধু

শাসনই করে, ব্যথার কথা কখনও কি শুনতে চায়? কিন্তু রাস্তার লোকের ভিড়ে তাহার কথায় বাধা পড়িয়া গেল।

দেবব্রত চুপ করিয়াই শুনিতে লাগিল। এ কথার কি জবাব সে দিবে? এমন করিয়া কোন দিনও তো সে ভাবিয়া দেখে নাই!

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিয়া গেল। বড় রাস্তা পার হইয়া অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় আসিয়া কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল, আমার কথাগুলো আপনার ভাল লাগছে না বোধ হয়।

দেবব্রত কহিল, ভাল লাগবে না কেন?

কল্যাণী ক্ষণকাল নিজের মনে কি ভাবিয়া লইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, জীবনে যাদের স্থায়িত্ব নেই, দেশে যাদের স্থান নেই, শুধু পরের বোঝা ব'য়ে যাদের দিন কাটে, তারাই যদি একদিন বলে—না, না, এমন হতে পারে না, দেশের কাছে দাবি আমাদের অনেক আছে, তবেই কি হবে অপরাধ?

দেবব্রত বলিল, না, অপরাধের কি আছে!

কিন্তু তাই তো মনে হয়, এই দাবির কথা বলাও যেন অপরাধ।—বলিয়া সে চুপ করিল।

তারপর কিছু দূর হাঁটিয়া একটা বাড়ির সম্মুখে আসিয়া দেবব্রত বলিল, এই আমার বাড়ি, ভেতরে যাবে?

আচ্ছা, চলুন।

গেট পার হইয়া কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল, এই বাড়িতে কি ক'রে দিন কাটে? বই পড়ে, না পরোপকার করে?

দেবব্রত ঈষৎ হাসিয়া জবাব দিল, কোনটাই হয়ে উঠছে না। একটা বাগান করেছি, চল, দেখবে।—বলিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া আসিল। চারিদিকে নানা জাতীয় ফুল ও ফলের গাছ সমস্ত বাড়িটা ঘিরিয়া রাখিয়াছে। দেবব্রত সেই সব তাহাকে দেখাইতে লাগিল। কোন্ গাছের কি নাম, কত দিনের পুরাতন, কোথা হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছিল, এই সব সবিস্তারে বলিতে লাগিল।

এক পাশে একটি ছোট পুষ্করিণী, তাহারই বাঁধানো ঘাটের উপর কল্যাণী আসিয়া বসিল। তখনও অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মি গাছের মাথার উপর ঝিকিমিকি করিতেছিল, সেই দিকে কিছুকাল নিস্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। নিজের মনে কি যেন সে ভাবিতেছিল এবং ঐ ভাবে কতক্ষণ যে কাটিয়া গেল সেদিকে তাহার খেয়াল ছিল না।

জহর কতকগুলি ফুল তুলিয়া আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া বলিল, কাল আপনার জন্যে একটা ভাল তোড়া বেঁধে রেখে দোব।

কল্যাণী বলিল, কাল তো আমি আসব না।

তবে কবে আসবেন ?

আর আসব না।

তবেই তো মুশকিল! কিন্তু আসবেন না কেন ? রোজ যদি আসতেন, তবে বড্ড ভাল হ'ত।

কল্যাণী ঈষৎ হাসিল, কিন্তু আর বসিল না। দেবব্রতকে বলিল, চলুন, এবার যাওয়া যাক।

দেবব্রত তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাহিরে লইয়া আসিল।

রাস্তায় আসিয়া কল্যাণী বলিল, আপনার সঙ্গে আর আমার হয়তো দেখা হবে না। আমি শিগগির এখান থেকে চ'লে যাব।

কবে চ'লে যাবে ?

মনে হচ্ছে, কাল পরশুর মধ্যেই যেতে হবে ; কিন্তু যাওয়ার আগে আপনাকে একটি কথা ব'লে যেতে চাই।

কি ?

সে কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, অরুণদার সঙ্গে আপনার দেখা হয় ?

মাঝে মাঝে হয়।

শুনেছি তাঁর সঙ্গে আপনি অনেক দিন ঘুরে বেড়ান, কিন্তু আমার একটা কথার জবাব দিতে পারেন ?

কি ?

হাত পেতে গ্রহণ করায় কি গৌরব আছে ?

না, তা তো নেই।

যে দান করে, তৃপ্তি তার ; কিন্তু যে গ্রহণ করে, তার তো সুখ নেই।

দেবব্রত বলিল, আমারও তো তাই মনে হয়।

তবে কি দেশের কাছে এ কথা জানাবেন না যে, এই ভিক্ষার ঝুলি তাদের পাওনা নয়, তারাও আত্মসম্মান নিয়েই বেঁচে থাকবার দাবি রাখে।

দেবব্রত এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবে সহসা ভাবিয়া পাইল না। কল্যাণী পুনরায় কহিল, এই নিঃস্বতার বোঝা ব'য়ে দেশ চলতে পারবে না, তাতে গৌরব নেই, তাই নয় কি ?

দেবব্রত বলিল, এই বোঝা যে কত বড়, আমি তা জানি, আমি স্বচক্ষে অনেকখানি দেখে এসেছি।

কিছুদূর আসিয়া সে পুনরায় বলিল, কিন্তু একটা অনুরোধ তোমায় আমার করবার আছে কল্যাণী।

কি ?

তোমার নিজের প্রতি একবারও কি দৃষ্টি দেবে না ?

কল্যাণী জিজ্ঞাসুনেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

দেবব্রত বলিল, এখান থেকে না গিয়ে, এই আশ্রম ছেড়ে তুমি কি চ'লে আসতে পার না ?

না, তার উপায় নেই।

উপায় যদি হয়, তবু কি পার না ?

না, আমাকে যেতে হবে।

দেবব্রত কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া পুনরায় বলিল, একটা কথা তোমায় বলব, অনেক দিন থেকেই ভাবছিলাম।

কি ?

আমার এই বাড়িঘর, আমার যা কিছু সব, তুমি কি নিতে পার না ?

কল্যাণী সহসা নিজের মনে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল, তারপর অস্ফুটস্বরে বলিল, না না, তা হয় না, আপনি আমার সব কথা বুঝবেন না।

দেবব্রত অনেকক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটিয়া আসিল, তারপর আবার বলিল, আমার আর একটা অনুরোধ করবার আছে কল্যাণী।

কি ?

যদি আবার কখনও তোমার দুঃসময় আসে, আমাকে একটা খবর দেবে ?

কল্যাণী এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া লইয়া বলিল, আচ্ছা, দেব।

তাহাকে গেট পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া দেবব্রত ফিরিয়া আসিল। কিন্তু কেমন যেন অপরাধীর মতই সে সমস্ত পথটা হাঁটিয়া আসিতে লাগিল।

১৮

আবার বর্ষা আসিয়াছে, নদীর জল কানায় কানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। শহরের চারিপাশে খাল, বিল, মাঠ ভাসিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। এহেন বাদলাদিনে দেবব্রত আবার তাহার বইগুলি বাহির করিয়া, সময়ে অসময়ে তাহারই মধ্যে ডুবিয়া থাকিবার প্রয়াস পাইতেছিল। কখন বা এক নিরালা পথ ধরিয়া এই জল-ভরা মাঠের ধার দিয়া সে অনেকদূর বেড়াইয়া আসে। এই শহরের সহিত তাহার তেমন পরিচয় নাই, তেমন মেলামেশাও নাই। কিন্তু মানুষের মুখে তো কিছু লেখা থাকে না, তবু একদল লোক কেমন করিয়া যেন তাহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছিল। তাই সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহার পড়িবার ঘরে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরে, তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা বলিয়া যায়, সে নির্ব্বাক হইয়া শুনিতে থাকে।

সেদিন আকাশ পরিষ্কার ছিল। সে বিকালের দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে শহরের এমন একটা স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহার সহিত তাহার তেমন পরিচয় নাই। এই স্থানের রাস্তাগুলি যেমন অপরিষ্কার, দুই ধারের বাড়িঘরও তেমনই জীর্ণ ও অপরিচ্ছন্ন। সে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া

আসিবার উপক্রম করিতে লাগিল। কিন্তু এমন সময় এক ব্যক্তি তাহাকে ডাক দিল, বাবুসাহেব!

লোকটি তাহার পরিচিত। সে নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এদিকে কোথায় চলেছেন বাবু?

দেবব্রত বলিল, কোথাও না, এমনই বেড়াতে এসেছি।

এখুনি কি ফিরে যাবেন?

হ্যাঁ, তাই তো ভাবছি। এই দিকেই তোমার বাড়ি বুঝি?

না, বাড়ি অনেক দূরে।

তবে এখানে কেন এসেছ?

একটু কাজ ছিল, একবার আপনার কাছেও যাব ভাবছিলাম।

আমার কাছে কি কাজে যেতে চেয়েছিলে?

লোকটি ইতস্তত করিয়া বলিল, একজনের বড্ড অসুখ বাবু, বোধ হয় বাঁচবে না। কেউ নেইও তার। তাই ভাবছিলাম, আপনাকে একটা খবর দিই, যদি কোন উপকার হয়।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় তার বাড়ি?

খুব কাছে, যাবেন একবার?

দেবব্রত এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া লইয়া বলিল, আচ্ছা, চল।

লোকটি আগে আগে চলিতে লাগিল এবং গোটা তিনেক সরু গলি পার হইয়া একটা খোলার ঘরের ভিতরে আসিয়া

উপস্থিত হইল। ঘরখানির বাহিরের দিক যাহাই থাক, ভিতরটা অনেক পরিষ্কার। মাটির দেওয়ালে সারি সারি কতকগুলি ছবি টাঙানো আছে এবং ঘরের জিনিসপত্রগুলিও এক কোণে সাজানো রহিয়াছে। এক পাশে একখানা তক্তাপোশের উপর একটি আঠার উনিশ বৎসরের স্ত্রীলোক রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিল। তাহার শিয়রের কাছে বসিয়া একটি প্রৌঢ়া পরিচর্য্যা করিতেছিল।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, কি অসুখ ?

লোকটি বলিল, জ্বর। কিন্তু আজ সকাল থেকে মাঝে মাঝে ভুল বকতে আরম্ভ করেছে।

ডাক্তার দেখাও নি ?

দেখিয়েছিলাম, কিন্তু ওষুধ এখনও আনতে পারি নি।

কেন ?

জবাব দিল স্ত্রীলোকটি, যে শিয়রের কাছে বসিয়া ছিল, কহিল, ওষুধ আনতে পয়সার দরকার হয়, এত পয়সা কোথায় পাওয়া যাবে ?

দেবব্রত কয়েক মুহূর্ত্ত কি যেন ভাবিয়া লইল, তারপর পকেট হইতে গোটা কয়েক টাকা বাহির করিয়া লোকটির হাতে দিয়া বলিল, তুমি ওষুধ নিয়ে এস, আমি এইখানে অপেক্ষা করতে থাকি।

লোকটি চলিয়া গেল। সে একপাশে একখানা টুলের উপর বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে সেই প্রৌঢ়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কাছে আর টাকা আছে?

আছে।

আমাকে দিন।

কেন, কি হবে টাকা দিয়ে?

শুধু ওষুধ খাওয়ালেই তো চলবে না, পেটেও তো কিছু দিতে হবে, সেসব যোগাড় হবে কি দিয়ে?

দেবব্রত দ্বিরুক্তি না করিয়া, পকেটে যাহা ছিল, সব বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল। স্ত্রীলোকটি চলিয়া গেল এবং কিছু কাল পরে এক বাটি পথ্য লইয়া আসিয়া রুগ্না স্ত্রীলোকটিকে খাওয়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিছু খাওয়াইল এবং অবশিষ্ট রাখিয়া দিল। তারপর আবার শিয়রের কাছে আসিয়া বসিল। কিন্তু এইক্ষণে তাহার মেজাজ অতিশয় প্রসন্ন মনে হইতে লাগিল। মুখ দিয়া তীব্র সুরার গন্ধ বাহির হইয়া আসিতেছিল। দেবব্রতর নাক জ্বালা করিতে লাগিল। কে জানে, যে পয়সাগুলি সে এইমাত্র তাহাকে দিল, তাহা দিয়াই ঐ অখাদ্য টানিয়া আসিল কি না! স্ত্রীলোকটি এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এখানে কোথায় থাকেন?

দেবব্রত বলিল, থাকি এই শহরেই কোথাও।

এই পাড়া, এই গলিতে আর কোন দিন এসেছেন ?

না।

এখানে কোন্ শ্রেণীর লোক বাস করে আপনি জানেন ?

না।

এই পাড়ায় যারা আসা-যাওয়া করে, সমাজে যে তাদের দুর্নাম র'টে যায়, আপনি কি তাও বুঝতে পারেন নি ?

না।

যখন এখান থেকে বেরিয়ে যাবেন, যদি পরিচিত লোক কেউ দেখতে পায়, তবে তো নিন্দে করতে থাকবে।

নিন্দে কেউ করবে না।

কিন্তু এই স্ত্রীলোকটির কথাবার্ত্তা তাহার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না এবং জবাব দিবারও প্রবৃত্তি হইতেছিল না, তাই সে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে প্রৌঢ়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, মানুষের কথায় কখনও বিশ্বাস করতে আছে, আপনি বলতে পারেন ?

দেবব্রত অনিচ্ছা সত্ত্বেও উত্তর দিল, কেন বিশ্বাস করতে নেই ?

লোকে যে মিথ্যে প্রলোভন দেখায়, মিথ্যে ভালবাসার কথা বলে, এসব আপনি জানেন ?

না।

এমন মানুষ তো কোথাও দেখি নি। অসহায় অবস্থার স্থবিধে নিয়ে লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে আনে, আপনি এসব শোনেন নি ?

স্ত্রীলোকটি কি কথা তাহাকে বুঝাইতে চাহিতেছে, দেবব্রত সহসা তাহা উপলব্ধি করিল, তাই সে চুপ করিয়া গেল।

সে বলিতে লাগিল, মিথ্যে ক'রেই একদিন নিয়ে আসে, আবার স্থবিধেমত এক সময় ফেলে চ'লে যায়। তারপর এমনই এক খোলার ঘরে বাসা বাঁধতে হয়, এসব কি আপনি বোঝেন না ?

দেবব্রত জবাব দিল না, নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল।

সে পুনরায় বলিল, স্বচক্ষে এমন কতই তো দেখতে পেলাম, কিন্তু এই যে নিঃস্ব ক'রে ফেলে রেখে যায়, জীবনধারণেরও সংস্থান থাকে না, এর কি উপায় আছে বলতে পারেন ? কিন্তু তাহার কথায় বাধা পড়িয়া গেল, ঔষধ হাতে করিয়া সেই লোকটি ফিরিয়া আসিল। বলিল, বড্ড দেরি হয়ে গেছে, আপনার কি খুব অস্থবিধে হয়েছে বাবু ?

না, কিছু অস্থবিধে হয় নি।

তারপর নিজ হাতে ঔষধ ঢালিয়া স্ত্রীলোকটিকে খাওয়াইয়া দিয়া সে বলিল, এইবার চলুন, আপনাকে রেখে আসি, আর অপেক্ষা করার দরকার নেই।

আচ্ছা, চল।

রাস্তায় আসিয়া দেবব্রত কহিল, এখন তো সঙ্গে কিছুই নেই, কাল একবার আমার কাছে যেও, যা দরকার হয় নিয়ে এস।

কেন, পয়সা তো আমার কাছে যথেষ্টই আছে, যদি দরকার হয় আবার চেয়ে নেব।

তবু কাল আমাকে একটা খবর দিও।

আচ্ছা, নিশ্চয়ই দোব।

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর হাঁটিয়া আসিয়া ফিরিয়া গেল।

পরদিন সকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি দেবব্রত অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল, হয়তো সেই লোকটি দেখা করিতে আসিবে। কিন্তু যখন আসিল না, তখন সে মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। অবশেষে সে নিজেই রওনা হইয়া গেল। তখন মেঘের ভারে আকাশ কালো হইয়া উঠিয়াছে। অল্প অল্প দুর্য্যোগের হাওয়াও বহিতে শুরু করিয়াছে। অতদূর রাস্তা হাঁটিয়া যখন সে আবার সেই খোলার ঘরে আসিয়া পৌঁছিল, তখন অন্ধকারে চারিদিক ঘিরিয়া ধরিয়াছে। সে দেখিল, ঘরের ভিতর দ্বিতীয় লোক নাই। কেবল সেই রুগ্না স্ত্রীলোকটি তক্তাপোশের উপর পড়িয়া আছে। জীবিত কি মৃত, ঠিক বুঝা যাইতেছিল না। এক কোণে একটি কেরোসিনের ডিবা মিটিমিটি জ্বলিতেছিল এবং

তাহারই পাশে গোটা কতক ঔষধের শিশি সাজানো আছে। আবার হয়তো ডাক্তার আসিয়াছিল এবং ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থাও ঠিকমতই হইয়াছিল, ইহা অনুমান করিয়া সে মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। স্ত্রীলোকটির শিয়রের কাছে এক বাটি পথ্য অভুক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। কি কারণে যে সে স্পর্শ করে নাই, তাহা সে বুঝিল না। শীঘ্রই হয়তো সেই লোকটি অথবা প্রৌঢ়া ফিরিয়া আসিবে, এই আশায় সে বসিয়া রহিল।

কিন্তু বাহিরে তখন বারিপাত প্রবলবেগে আরম্ভ হইয়াছে। ঝড়ো হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছে। সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু দুর্যোগ ক্রমশই যেন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আকাশ-ভরা মেঘের ডাকে অন্তরাত্মা চমকাইয়া উঠিতে লাগিল। দমকা হাওয়া বারে বারে সেই খোলার ঘর কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল। এই সময় স্ত্রীলোকটি একবার চোখ মেলিয়া চাহিল। কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে দেবব্রতর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আবার চক্ষু বন্ধ করিল। কিন্তু ইহার পর হইতেই সে অসংলগ্ন কথা বলিতে আরম্ভ করিল, আপনি শিগগির পালিয়ে যান, ঐ যে তারা এল, ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, এখুনি এসে ঘিরে ধরবে—এইসব। দেবব্রত মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। কিন্তু

তাহার এই প্রলাপ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাই সে উঠিয়া আসিয়া ঔষধ খাওয়াইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিল। তারপর আবার চুপ করিয়া বসিল। কিন্তু পারিল না, তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। একবার সে ছুটিয়া বাহিরে যাইতে চাহিল, যদি ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে পারে, এই আশায়। কিন্তু কোথায় যাইবে সে? উন্মত্ত ঝ'ড়ো হাওয়া তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। সে আবার আসিয়া ঘরে ঢুকিল। আবার ঔষধ খাওয়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। এইভাবে কতক্ষণ যে কাটিয়া গেল, ঠিক নাই। অবশেষে স্ত্রীলোকটি একসময়ে অসাড়, নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে ঝড়ের বেগ ক্রমশ কমিয়া আসিতে লাগিল। এমন সময় সেই লোকটি অকস্মাৎ ঘরে ঢুকিল। দেবব্রতকে দেখিয়া বলিল, বাবু, আপনি এইখানে ব'সে আছেন? আমি সমস্ত দিন এই ঘর ছেড়ে কোথাও যেতে পারি নি। সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার ডাকতে গিয়েছিলাম, কিন্তু ঝড়-বৃষ্টির জন্যে তাও পারলাম না।

দেবব্রত বলিল, আর ডাক্তার ডাকবার দরকার নেই।

আমি তা জানি বাবু, সব শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কি করব, আমার কোন দোষ নেই। আমি সমস্ত দিন অনেক পরিশ্রম করেছি।

এমন সময় সেই প্রৌঢ়া ঘরে ঢুকিল। অপর কয়েকজন স্ত্রীলোকও আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল।

লোকটি বলিল, বাবু, এইবার আপনি চলুন, অনেক রাত হয়ে গেছে।

দেবব্রত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সে আবার বলিল, বাবু, এখন যে কাজ বাকি আছে, তা সম্পন্ন করা কিছু শক্ত নয়, আমরা খুব পারব। তাই আপনি চলুন, আর দেরি করবেন না, আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি।

দেবব্রত আপত্তি করিল না। অন্যমনস্কভাবে বাহির হইয়া আসিল। লোকটির পিছনে পিছনে নিঃশব্দে হাঁটিয়া আসিতে লাগিল। সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার পথে চলিতে চলিতে কয়েক ফোঁটা অশ্রু তাহার দুই চক্ষু হইতে ঝরিয়া পড়িল। সে অলক্ষ্যেই তাহা মুছিয়া ফেলিল।

১৯

এই ঘটনার পর হইতেই দেবব্রত কেমন যেন বিমনা হইয়া পড়িয়াছে। তাহার বদ্ধমূল ধারণাগুলি অনেকখানি শিথিল হইয়া গিয়াছে। অতীতের অনেক কথাই এখন তাহার মনের মধ্যে ভিড় করিতে থাকে। নৃপেন্দ্রের সেই দাম্ভিক উক্তিগুলি সে আবার শুনিতে পায়। তারপর আসিল মিহির, তাহার তরুণ মুখচ্ছবি এবং অসময়ে চিরবিদায় সে স্পষ্ট দেখিতে পায়। ক্রমে ক্রমে ব্যানার্জ্জী সাহেব, কারখানা ও কুলি-পাড়া হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামের সেই অনাহারক্লিষ্ট মূর্ত্তিগুলি এবং সর্ব্বশেষে এই স্ত্রীলোকটির মৃত্যু অবধি যাহা সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, সমস্ত তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। তাহার নিজের পায়ে চলা পথের ঘটনাগুলি একে একে সারি বাঁধিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, যেন বিদ্রূপ করিয়া বলিতে থাকে, দেখ দেখ, তোমার সমাজের চেহারাখানা একবার দেখিয়া লও। ইহাকে তুমি একদিন কতই না সুচক্ষে দেখিতে। তাহার অন্তরাত্মা চমকাইয়া উঠে। মনে মনে কেবলই সে প্রশ্ন করিতে থাকে, ইহাই কি পথের ধারা, এই কি সমাজের রাজপথ?

কিন্তু আদর্শবাদী দেবব্রত তবু এসব বিশ্বাস করে না। সবলে সমস্ত চিন্তা ঠেলিয়া ফেলিয়া সে মনে মনে বলিতে থাকে, না না, এতবড় সমাজের ইহাই সবখানি নয়। যাহা তাহার চোখে পড়িয়াছে, তাহা একটা অংশ মাত্র। সে অংশ যত বড়ই হউক, তবু ভাল একটা দিক তো নিশ্চয়ই আছে। ভাল হউক, কল্যাণ হউক, ইহাই সে কামনা করে, এবং এই বিশ্বাস লইয়া, এই আশা লইয়াই সে জীবন-পথে চলিতে চাহে।

এই বাদলা-দিনের এক সন্ধ্যায় কাঁধে ব্যাগ ঝুলাইয়া জলে ভিজিতে ভিজিতে অকস্মাৎ অরুণ আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবব্রত অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এমন হঠাৎ কোথা থেকে এলে অরুণ? আজ যে তুমি আসবে, তা ভাবতেও পারি নি।

অরুণ বলিল, তোমার ভাববার তো কথা নয়। হঠাৎ যারা আসে, তাদের কথা কি আগে ভাবতে পারা যায়?

তবে এতদিন কোথায় ছিলে? আমায় একটা খবরও তো দাও নি।

খবর না দেওয়া যে আমার স্বভাব, তা কি তোমাকে বলতে হবে।

দেবব্রত তাহাকে সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া আসিল। কাঁধের ব্যাগ নামাইয়া রাখিয়া, ভিজা জামা খুলিতে খুলিতে

অরুণ জিজ্ঞাসা করিল, তারপর তোমার খবর কি? অনেক-দিন শুনতে পাই নি।

দেবব্রত কহিল, খবর বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু তোমায় এত রোগা দেখাচ্ছে কেন?

অরুণ বলিল, দেহটার কি আর দোষ, একটু আধটু রোগা না হয়ে কি করে বল?

একটু? কতদিন নিজের চেহারা চেয়ে দেখ নি?

দেখেই বা কি লাভ, না দেখাই বরং ভাল।

এতদিন একবারও কি আসতে পার নি? দিনগুলো কাট-ছিল নিরানন্দে।

নিরানন্দে কেন?

অনেক কারণে, তার মধ্যে একটা এই যে তোমায় খুঁজে বার করতে পারছিলাম না।

অরুণ হাসিয়া উঠিল। দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, এমন ভারী ব্যাগ ঘাড়ে ক'রে এসেছ কেন? আবার কোথাও চ'লে যাবে না তো?

চ'লে যে যাব না, এমন কথা হলফ ক'রে বলতে পারব না।

কি আছে তোমার ঐ ব্যাগের ভেতর?

বিশেষ কিছু নেই, খুলে দেখলেই বুঝতে পারবে।

দেবব্রত ব্যাগটি খুলিয়া ফেলিয়া, জিনিসগুলি একটি একটি

করিয়া বাহির করিতে লাগিল। ভিতর হইতে বাহির হইল, কয়েকটা জামাকাপড়, কিছু কাগজপত্র, একটা ভাঙা বেহালা। কয়েকখানা ভিজা রুটি এবং যৎসামান্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস।

সে জিজ্ঞাসা করিল, এই রুটিগুলো দিয়ে কি হবে? ফেলে দেওয়া যাক, কি বল?

অরুণ বলিল, দিতে পার, এবং তোমার কাছে যে ওগুলোর মূল্যও কিছু নেই তাও আমি জানি। কিন্তু আমার কাছে মূল্য আছে অনেক।

কি মূল্য আছে?

অনেক সময় ঐগুলোই আমার জীবন রক্ষা করে।

করুক, কিন্তু তোমায় শিগগির যেতে দোব না, মনে থাকে যেন।

অরুণ ঈষৎ হাসিল, উত্তর দিল না।

দেবব্রত কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার এই যন্ত্রটা কখনও কি বাজে? না শুধু ব'য়েই বেড়াও?

অরুণ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কখন যে বাজে না এমন কথাই বা কি ক'রে বলি! তবে তারগুলো ছিঁড়ে পড়বার উপক্রম হয়েছে কিনা, তাই তেমন বাজতে চায় না।

দেবব্রত বলিল, আর যাই কর অরুণ, তারগুলো শক্ত ক'রে বেঁধে রেখো।—বলিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

জহর আসিয়া বলিল, বাবু, রান্না-বিদ্যে একেবারেই ভুলে গিয়েছি, যদি অনুমতি করেন—

অরুণ বলিল, আমাকে কি অনুমতি করতে হবে জহর ?

যদি বলেন, তবে বিদ্যেটা ঝালিয়ে নিতাম, যে কদিন থাকবেন পরখ ক'রে দেখতেন।

অরুণ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, ব্র্যাভো জহর, আমার কিছু আপত্তি নেই, তুমি চেষ্টা করতে থাক।

জহর খুশি হইয়া চলিয়া গেল।

আজ এই নিরালা বাড়ি সহসা যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকের গাছপালাগুলিও বারে বারে দোল খাইতে লাগিল।

অনেকদিন পর জহরের সেবা ও যত্ন এবং সর্ব্বশেষে কোমল শয্যা,—অরুণের অনভ্যস্ত দেহটা কেমন যেন নূতনত্বের আস্বাদ পাইতে লাগিল।

পরদিন ভোরবেলা উঠিয়া অরুণ নিবিষ্ট মনে কি যেন লিখিতেছিল। চারিদিকে চিঠি ও কাগজপত্র ছড়ানো রহিয়াছে। দেবব্রত আসিয়া বলিল, এত ভোরেই কি লিখতে আরম্ভ করেছ ?

অরুণ বলিল, অনেকগুলো চিঠি জমা হয়ে আছে, জবাব দেওয়া হয় নি, তাই ভাবছি আজ সব শেষ ক'রে ফেলব।

অনেক ফোটোও দেখতে পাচ্ছি, ওগুলো কি?

আমার এক বন্ধু এইসব পাঠিয়ে দিয়েছেন।—বলিয়া ফোটোগুলি তাহার দিকে ঠেলিয়া দিল।

দেবব্রত দেখিল, দুর্ভিক্ষ ও বন্যা পীড়িত লোকদের ফোটো, বিভিন্ন অবস্থা ও বিভিন্ন স্থান হইতে তোলা হইয়াছে। সেই অস্থিচর্ম্মসার মূর্ত্তি, রেল-লাইনের ধারে, কি, কোন উচ্চ স্থানে আশ্রয় লইয়াছে। কেহ বা নিকটেই নশ্বর দেহ ফেলিয়া রাখিয়া বিদায় লইয়াছে, এইসব।

অরুণ কহিল, বন্ধু একবার আমায় যেতে অনুরোধ করেছে, কি করব তাই ভাবছি।

দেবব্রত বলিল, বন্ধু অনুরোধ না করলেও তুমি কি চুপ ক'রে ব'সে থাকতে?

অরুণ ঈষৎ হাসিল, উত্তর দিল না।

অনেকক্ষণ পর অরুণ বলিল, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম।

কি কথা?

কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

হয়েছিল।

বলে নি কিছু ?

বলেছিল অনেক কথাই, বিশেষ ক'রে নিঃস্ব লোকদের দাবির কথা দেশের কাছে জানাতে অনুরোধ করেছে।

অরুণ বলিল, আমাকে একখানা চিঠি সে লিখেছিল।

কি লিখেছিল ?

লিখেছিল যে, এতদিন ধ'রে নিজের জীবনে যা সে সয়েছে তা ভোলবার নয়। যদি বাকি দিনগুলোও তার ঐভাবেই কেটে যায়, যাক না, ক্ষতি কি তাতে ? কিন্তু স্বেচ্ছায় এত অবিচার মাথা পেতে সে মেনে নিতে পারবে না। তেমন জীবনের মূল্য নেই, এইসব।

দেবব্রত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল, তারপর এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিল, অজিতের কোন খবর রাখ ?

অরুণ বলিল, অনেকদিন হ'ল একখানা চিঠি তার পেয়েছিলাম, কিন্তু তারপর আর কোন খবর পাই নি।

কি লিখেছিল সে ?

লিখেছিল যে নিজের দেশে তার স্থান হয় নি, কিন্তু সেই অসভ্যরা তাকে আপন ক'রে রেখেছে। তাদের সঙ্গেই সে জীবনটা সার্থক ক'রে তুলতে চায়।

দেবব্রত চুপ করিয়া রহিল। চিঠি লেখা শেষ করিয়া অরুণ

যখন উঠিয়া আসিল, তখন বেলা অনেক হইয়া পড়িয়াছে। জহর আসিয়া বারে বারে অনুরোধ জানাইতেছিল।

সেই দিন বিকালের দিকে, বেলা যখন কেবল পড়িয়া আসিতেছিল, অরুণ উঠিয়া, ব্যাগটা কাঁধে লইয়া বলিল, এইবার তা হ'লে যাওয়া যাক, কি বল ?

দেবব্রত সবিস্ময়ে বলিল, আজই যাবে, এমন তো কথা ছিল না !

অরুণ বলিল, আজ যে যাব না, এমনই কি কথা ছিল ?

না থাক, তবু আজ না, গিয়ে কি তোমার চলবেই না ?

যদি চলত, তবে তো যাবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

দেবব্রত বুঝিল যে, তাহাকে অনুরোধ করা বৃথা, তাই সে উঠিয়া জামা গায়ে দিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল।

রাস্তায় আসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, আজ তো আমায় সঙ্গে নিতে চাইলে না ?

আজ সঙ্গে নেবার প্রয়োজন নেই, তাই।

তোমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে ?

শিগগিরই দেখা হবে, এই শহরেই ফিরে আসব।

তাই এসো, আমি অপেক্ষা করব।

অরুণ কিছুকাল নীরবে হাঁটিয়া আসিল, তারপর যেন

আপন মনেই বলিতে লাগিল, দেশের বুক থেকে এই নিঃস্বতার করুণ মূর্ত্তি মুছে ফেলতে হবে। দেশ জুড়ে যাতে গ'ড়ে ওঠে পার্থিব সুখ-সম্ভার আর স্বাধীনতার ভিত্তি তারই চেষ্টা করতে হবে, নতুবা এই দুর্দ্দশার অবসান কেমন ক'রে হবে?

দেবব্রত উৎসাহের সহিত উত্তর দিল, তাই চল অরুণ, এখন থেকে সেই পথেই চলতে থাকি। তাতেই সত্যিকার উপকার হবে।

অরুণ বলিতে লাগিল, এই পুরাতন পথে, এই সাবেক কালের বিধি-ব্যবস্থা নিয়ে যদি চলতে থাকি, তবে দেশের কোন উপকার হবে না। এই দারিদ্র্য, এই অনাহারের অবসান হবে না। তাই নূতন ব্যবস্থা, নূতন সমাজ গ'ড়ে তুলতে হবে।

দেবব্রত কহিল, আমিও তো সেই কথাই বলি, এই সমাজটা এমন ক'রে গড়তে হবে, লোকের যাতে সচ্ছলতা আসে, স্বাধীনতা ও অবসর থাকে; এস, তারই আয়োজন করতে থাকি।

অরুণ চুপ করিয়া হাঁটিয়া আসিতে লাগিল।

শহরের এক পাশ দিয়া একটা ছোট নদী বহিয়া গিয়াছে। সে তাহারই পাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিছুক্ষণ এদিকে ওদিকে চাহিয়া কি যেন অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, কি খুঁজছ ?

একখানা ডিঙি-নৌকো আসবার কথা ছিল, তাই দেখ-ছিলাম।

নদীর পাড়ে বাঁধানো ঘাটের উপর পাশাপাশি কয়েকখানা বেঞ্চ পাতা আছে, তাহারই একখানার উপর দুইজনে আসিয়া বসিল।

সম্মুখে, ঠিক ওপারে, কলেজের বিশাল অট্টালিকা তাহাদের চোখে পড়িল। তখনও ছুটি হয় নাই, বই হাতে ছেলের দল সিঁড়ি দিয়া উঠা-নামা করিতেছিল। অরুণ সেই দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কলেজের ঐ দিনগুলো এখন স্বপ্নের মতই মনে হয়, কি বল ?

দেবব্রত বলিল, অনেকটা তাই মনে হয়।

অরুণ বলিল, কিন্তু বাস্তবের পথে এত যে মিথ্যা প্রতিদিন ঠেলতে হয়, এ কথা সেদিন কি জানা ছিল ?

দেবব্রত চুপ করিয়া রহিল। সে পুনরায় কহিল, কলেজের শিক্ষা-দীক্ষা, আর এ পথের সত্যিকার পরিচয়ে কতই না প্রভেদ !

নদীর বুকে ছোট ছোট নৌকাগুলি পাল তুলিয়া ভাসিয়া চলিয়াছিল। যেন খেয়ালী মনের মতই হাওয়ার সঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে, এমনই বোধ হইতে লাগিল। সন্ধ্যার আঁধার

কেবল ঘনাইয়া আসিয়াছে, এমন সময় একটি যুবক একখানা ডিঙি বাহিয়া সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, বড্ড দেরি হ'য়ে গেল, এত চেষ্টা ক'রেও সময়মত আসতে পারলাম না।

অরুণ কহিল, না, খুব বেশি দেরি হয় নি।

ছেলেটি বলিল, নদীতে যে স্রোত, ঠেলে আসতে অনেক সময় লেগে গেল। আপনি কতক্ষণ অপেক্ষা করছেন ?

বেশিক্ষণ নয়।

ছেলেটির বলিষ্ঠ দেহ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেদিকে তাহার খেয়াল ছিল না, মুখের হাসি তাহাতে ম্লান হয় নাই, বরং সে যে দেরি করিয়া আসিয়াছে এই লজ্জাই তাহাকে পীড়া দিতেছিল।

সে বলিল, এখনই যাবেন, না, আর কাজ আছে ?

অরুণ বলিল, না, আর কিছু কাজ নেই। তারপর দেবব্রতর দিকে চাহিয়া বলিল, এখন তা হ'লে যাওয়া যাক, কি বল ?

আচ্ছা, কিন্তু শিগগিরই ফিরে এসো।

তাই আসব, বেশি দেরি হবে না।

ছেলেটি ডিঙিখানা স্রোতের মুখে ঠেলিয়া দিল। ছোট নৌকা, অল্প সময়ের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া গেল। দেবব্রত সেই দিকে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া ফিরিয়া আসিল।

২০

ছোট এক রেলওয়ে-স্টেশনের ধারে প্রাচীর দিয়া ঘেরা পাদ্রী সাহেবের শিল্প-কুঠি বহু দূর হইতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কতকগুলি নিরাশ্রয় লোক এইখানে নানা-বিধ শিল্পকর্ম্ম করিয়া জীবিকা-উপার্জ্জন করে। কেহ বা বাগানের ভিতর ছোট ছোট কুটীরে বাস করে। ইহাই তাহাদের বাড়িঘর, সব। কিছুকাল হইতে এই আশ্রমের অবস্থা অতিশয় খারাপ চলিতেছিল। এই দারুণ প্রতি-যোগিতার দিনে ইহার অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিতে-ছিল। বৃদ্ধ পাদ্রী সাহেব চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

প্রায় এক বৎসর হইল, কল্যাণী এইখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে, সে আসিয়া অবধি অতিশয় পরিশ্রম করিতেছিল। বোধ করি নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিত। দিনে রাতে, সময়ে অসময়ে, সে অবিশ্রাম খাটিয়া যাইত। তাই আধ-ভাঙা দেহটা তাহার বারে বারে অসুস্থ হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার চারিদিকে শুধু চোখে পড়িত নিরুপায় ও হতাশ মূর্ত্তি, অসহায় ও রুগ্ন দেহ। তাই সে তাহার কষ্টো-পার্জ্জিত পয়সাগুলি তাহাদের দিয়া দিত। যেন এই সামান্য

দেওয়াতেই তাহাদের তুর্দ্দিনের অবসান হইবে। কিছু টাকা সে এতদিন ধরিয়া জমা করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাও সে একদিন কি ভাবিয়া বিলাইয়া দিল। রুগ্ন লোকের শিয়রে বসিয়া, কত রাত্রিই যে সে জাগিয়া কাটাইয়াছে, তাহারও সীমা নাই। ইহা তাহাকে কেমন যেন নেশার মতই পাইয়া বসিয়াছিল।

এমনই করিয়াই একটি বৎসরের মধ্যে সে তাহার দেহটা অসাড় করিয়া তুলিয়াছে। এমন যে হইবে, সে তাহা নিজেও ভাবে নাই। এখন সে কেবল তাহার রুগ্ন দেহটা টানিয়া লইয়া চলে। যেন তাহার জীবনের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, এমনই মনে হইতে থাকে।

রেলওয়ে-স্টেশনের ধার দিয়া যে রাস্তাটা বরাবর গ্রামের ভিতর চলিয়া গিয়াছে, সেই রাস্তায় মাঝে মাঝে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। বেলা-শেষে কুঠি হইতে বাহির হইয়া সে কিছুদূর হাঁটিয়া আসে, বাহিরের গাছপালা, নদী, মাঠ প্রভৃতি দেখিয়া ফিরিয়া যায়। এই পৃথিবীর সহিত দেনা-পাওনা সবই যেন তাহার মিটিয়া গিয়াছে। প্রতি পদে দেহ তাহার ক্লান্তিতে ভরিয়া উঠে, তবু সে তাহা টানিয়া লইয়া চলে। কখন বা পথের পাশে বসিয়া বিশ্রাম করিয়া লয়।

কিন্তু এইখানে, এই গাছপালা-ঘেরা নিরালা পথের ধারে, বসিয়া বসিয়া সে স্বপ্ন দেখে।—যেন দেবব্রত তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বলিতেছে, চল যাই, আমি যে তোমার অপেক্ষায়ই ব'সে আছি। সে যেন সহসা সাড়া দিয়া উঠিয়া বলে, চল চল, আমিও যে ব'সে আছি। আজ আর আমি ফেরাব না তোমায়।—বলিয়া হাত ধরিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। কিন্তু অকস্মাৎ চারিদিক হইতে পাখির ডাকে স্বপ্ন তাহার টুটিয়া যায়।

সে উঠিয়া আসে, আবার খানিকটা হাঁটিয়া আসিয়া এক গাছের তলায় বসিয়া পড়ে। আবার সে স্বপ্ন দেখে, যেন দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া এই পৃথিবীর সমস্ত সুখের দুয়ারে, চাঁদের আলোতে, পুষ্পোদ্যানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার সব সাধ, সব আশা পূরণ করিয়া লইতেছে। কিন্তু বসন্তের ফুরফুরে হাওয়ায় গাছের পাতা দুলিয়া উঠে। ঝরা-ফুল তাহার মুখে চোখে ছড়াইয়া পড়ে, সুখস্বপ্ন তাহার ভাঙিয়া যায়। সে চমকাইয়া উঠে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ফিরিয়া আসে।

অনেকদিন পর পাদ্রী সাহেব কুঠিতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে দেখিয়া মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। একসময় ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

সেবারের অসুখের কথা তোমার মনে আছে ?

আছে।

নিজের প্রতি দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন বুঝি তুমি বোধ কর না ?

কল্যাণী চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, এই রুগ্ন দেহ কতদিন টেনে বেড়াবে ? কিছু টাকা ছিল, শুনলাম তাও নাকি বিলিয়ে দিয়েছ ?

কল্যাণী তবু উত্তর দিল না।

সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, এই পৃথিবীতে এসব কতই না অদ্ভুত। পাওনাই যেখানে সব, স্তূপের পর স্তূপ পাহাড়ের মত জমতে থাকে, তবু যেখানে আশা মেটে না, সেখানে কিছুই যার নেই, সে আসে বিলিয়ে দিতে, এসব কেমন ধারা মন ?

সাহেব ডাক্তার ডাকাইয়া তাহার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন নানাভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধি তাহার দেহে প্রবেশ করিয়াছে। সে কেমন করিয়া আরোগ্যলাভ করিবে ? অবশেষে তিনি তাহাকে একটা যক্ষ্মা-হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন।

প্রায় এক মাস হইল, কল্যাণী হাসপাতালে আসিয়াছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তাহার ব্যাধির কোন উপশম হয় নাই। বরং ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছিল। এখন কেবলই মনে হইতে লাগিল যে, বিদায়ের দিন তাহার ঘনাইয়া আসিয়াছে। কিছু-দিন হইতেই দেবব্রতর অনুরোধের কথা তাহার অহরহ মনে পড়িতেছিল। সে অনেক করিয়া বলিয়াছিল যে, অন্য সময়ে না হউক, দুর্দ্দিনে যেন তাহাকে একটা খবর দেওয়া হয়। সেই অনুরোধ সে রক্ষা করিল।

২১

বসন্তকাল প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কখন যেন তাহা দেখা দিয়াছিল, আবার আপনি বিদায় লইতে চলিয়াছে। এতদিন চারিদিক কি সাজে সাজিয়া উঠিয়াছিল, গাছে গাছে কত ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া গিয়াছে, এসব কেহ কি তেমন করিয়া চাহিয়া দেখিয়াছিল ?

কিন্তু এইক্ষণে দেবব্রতর মন, কি জানি কেন, সহসা উতলা হইয়া উঠিল। যেন প্রতি ঝরা-ফুল তাহাকে ডাকিয়া বিদায় লইয়াই ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার জীবন হইতেও সমস্ত আনন্দ, সমস্ত মাধুর্য্য মুছিয়া যাইতেছে, এমনই মনে হইতে লাগিল।

সেই যে সেদিন অরুণ চলিয়া গেল, তাহার পর হইতে এই সময়টা কিভাবে যে তাহার কাটিয়া গিয়াছে, তাহা সে নিজেও অনুভব করে নাই। কিসের প্রেরণায় সে যেন মাতিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত দিন সে নানা কাজে ডুবিয়া থাকে, ঘর-ছাড়া হইয়া বাহিরে বাহিরেই কাটাইয়া দেয়।

পথের পাশে, তরুণের দল যেখানে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তাহাদের মাঝখানে দেবব্রতকে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। সে তাহার নিজের অভিজ্ঞতার কথা, মানুষের দুর্দ্দশার

কথা, যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছে, সেইসব বলিতে থাকে। সেই সহজ ও সত্য কথাগুলি তাহাদের অন্তর স্পর্শ করে। সম্মুখে দুর্দ্দিন আরও ঘনাইয়া আসিবে, যদি তাহারা জাগিয়া না উঠে। যদি তাহাদের চলিবার এই পুরাতন ও বন্ধুর পথটা তাহারা নূতন করিয়া গড়িয়া না তোলে, যদি সহজ করিয়া না লয়, তবে সারা জীবন দেহ ও মন ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিবে, শুধু ব্যর্থতার বোঝা বহিয়াই চলিতে হইবে, এই কথাই সে তাহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করে।

দিন যখন তাহার এইভাবে কাটিতেছিল, তখন হঠাৎ সে একদিন কল্যাণীর চিঠি পাইল। কিন্তু ইহা যে এমন দুঃসংবাদ বহন করিয়া আনিবে, তাহা সে কল্পনাও করে নাই। সে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল এবং কালবিলম্ব না করিয়া রওনা হইয়া গেল।

হাসপাতালের একটা ছোট কুঠুরিতে কল্যাণীর সহিত তাহার দেখা হইল। বাহির হইতে তাহাকে দেখিয়া এমন কিছু পরিবর্ত্তন অনুভব হয় না। তাহার চোখের দৃষ্টি তখনও তেমন ম্লান হয় নাই। দেবব্রতর অনেক প্রশ্নই করিবার ছিল, কিন্তু তাহার প্রয়োজন আর সে বোধ করিল না। শুধু জিজ্ঞাসা করিল, এমন দিনে ডেকে পাঠাবে, এই কি আমার অনুরোধ ছিল?

কল্যাণী হাসিবার চেষ্টা করিল, উত্তর দিল না।

দেবব্রত আবার বলিল, তুমি চল, সেরে ওঠ, আমি যে তোমায় নিতে এসেছি।

কল্যাণী আবার হাসিল, কিন্তু সেই হাসি সমস্ত ঘরে যেন ছড়াইয়া পড়িল।

নিকটেই একটা হোটেলে সে আশ্রয় লইয়াছে। কিন্তু সমস্ত দিন হাসপাতালেই সে কাটাইয়া দেয়।

কল্যাণী জড়িত কণ্ঠে, মূর্চ্ছার ঘোরে, সময় সময় বলিতে থাকে, তুমি যাও, ফিরে যাও, ব'সে থেকো না। আমার সব আশা, সব সাধ মিটে গেছে। তোমাকেই যখন পেয়েছি আমি, এই পৃথিবীতে আমার আর কি চাই ?

এইভাবে কতদিন যে কাটিয়া গেল, সেদিকে তাহার খেয়াল ছিল না। প্রতিদিন হাসপাতাল হইতে ফিরিবার পথে কেবল এই কথাই সে ভাবিতে থাকে যে, এই পৃথিবীতে যাহা ভাল, যাহা দুর্লভ, তাহা কি এমন অসময়েই বিদায় লইয়া যায় ?

এমন সময় একদিন অরুণ আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবব্রত জিজ্ঞাসা করিল, আমার চিঠি পেয়েছিলে ?

অরুণ বলিল, চিঠি পেয়েই তো এলাম।

এসেছ ভালই করেছ, কিন্তু এখন আর করবার কিছু নেই, সবই প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কিছু লাভ হ'ল না।

অরুণ বলিল, লাভ-লোকসানের কথা এখন আর আমি ভাবি না। চোখের সামনে এসব কতই তো দেখতে পেলাম।

দেবব্রত কিছুকাল চুপ্ করিয়া থাকিয়া বলিল, অজিতকেও একখানা চিঠি দিয়েছিলাম, কিন্তু তার কোন জবাবও পেলাম না।

অরুণ বলিল, হয়তো চিঠি সে পায় নি, অন্য কোথাও চ'লে গেছে।

প্রতিদিন দুইজনে হাসপাতালে বহুক্ষণ কাটাইয়া দেয়। তারপর অনেক পথ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে। দূরে নদী, মাঠ, বন তাহাদের চোখে পড়ে। মানুষের গড়া সমাজটা এই অপরূপ প্রকৃতির ক্রোড়ে বড়ই বিসদৃশ মনে হয়। কেমন করিয়া ইহার পরিবর্ত্তন হইবে, সেই কথাই তাহারা বলাবলি করে।

সেদিন বেলা-শেষে আকাশ মেঘে কালো হইয়া উঠিয়াছিল। কল্যাণীর শেষ মুহূর্ত্তও ঘনাইয়া আসিল। দুইজনে সেই নশ্বর দেহটা বহিয়া যখন নদীর পাড়ে লইয়া আসিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, চারিদিকে আঁধার নামিয়া আসিয়াছে। তবু সেই অন্ধকারে কল্যাণীর শুভ্র দেহটা স্পষ্ট চোখে পড়িতেছিল। যেন রাশিকৃত বেলফুল কেহ ফেলিয়া রাখিয়াছে, এমনই মনে হইতে লাগিল।

সমস্ত কাজ শেষ করিয়া, অনেক রাত্রে যখন তাহারা

নদীর পাড় ছাড়িয়া রাস্তায় উঠিয়া আসিল, তখন অন্ধকারের বুক চিরিয়া বারে বারে বিজলী চমকাইতেছিল। আকাশে ঘনঘটা আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সেই আঁধার পথে চলিতে চলিতে দেবব্রত সহসা থামিয়া গেল, হাঁটু ভাঙিয়া বসিয়া পড়িল।

অরুণ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, চল দেবব্রত, চল। আকাশে মেঘ করেছে, ঝড় উঠবে এখুনি, চল।

দেবব্রত সাড়া দিল না। অরুণ পুনরায় বলিল, সম্মুখে পথ দেখি না, আঁধারে ঘিরে ধরেছে। অনেক দূর যেতে হবে, ওঠ।

দেবব্রত কিছুকাল বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া আসিল, তাহার পিছনে পিছনে হাঁটিয়া চলিল। ঘন মেঘ তখন বারে বারে গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল। দুর্য্যোগের হাওয়া প্রতি পদে তাহাদের পথ রোধ করিতে লাগিল।

শেষ